দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ভারতীয় চিত্রকলার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার শুরুতেই অবলীলাক্রমে প্রশ্ন জেগে ওঠে – বৈশিষ্ট্য কি? কিংবা বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা কি বুঝি? এক্ষেত্রে বিস্তৃত কোনও ব্যাখ্যার অপ্রসাঙ্গিক অবতারণা না করে সরল ও সহজভাবে বলা যায়-- যে সকল গুণাবলী, বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র, রূপাকৃতির পরিকাঠামো, ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় চিত্রকে পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশ বা সমাজের চিত্রকলা থেকে অনন্যতা, স্বকীয়ত্ব ও বিশেষত্ব দান করেছে, সেই সকল গুণাবলী এবং বিষয়গত ও রূপগত স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীকেই ভারতীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য বলে তুলে ধরা যায়। চিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ব্যতীত চিত্রের রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। বিশেষ করে ভারতীয় মার্গ-চিত্রের রহস্য, মহত্ত্ব, উদ্দেশ্য এবং নিগূঢ়ার্থের অনুভব চিত্রবৈশিষ্ট্যের জ্ঞানোপলব্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন গুণ-সমন্বিত ভারতীয় চিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ।

ভারতীয় চিত্রকলার গুরুত্বপূর্ণ রূপগত ও বিষয়গত বৈশিষ্ট্য ঃ

১) ভারতীয় মার্গচিত্রে প্রকৃতি ও জীবজগতের সাদৃশ্যমূলক রূপাদর্শ।

২) ভারতীয় মার্গচিত্র প্রতীকাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী।

৩) শিল্পশাস্ত্র নির্ভর চিত্রকলা।

৪) জীবজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কভিত্তিক চিত্রকলা : ভারতীয় চিত্রকলায় প্রাণীজগতের অবস্থান।

৫) ধর্মীয় তত্ত্ব, তথ্য এবং কাব্য ও মহাকাব্যের কাহিনী নির্ভর চিত্রকলা।

১) ভারতীয় মার্গ-চিত্রে প্রকৃতি ও জীবজগতের সাদৃশ্যমূলক রূপাদর্শ ঃ

ভারতীয় মার্গ-চিত্রকলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতি ও জীবজগতের সাদৃশ্যমূলক রূপাদর্শ। মানুষের আকৃতি কেমন হওয়া উচিত-- এই জিজ্ঞাসা রূপাদর্শ সন্ধানীকে যুগে যুগে বিচলিত করেছে। কারণ মনুষ্যাকৃতির কোনও নির্দিষ্ট আদর্শ মানব সমাজে খুঁজে পাওয়া কঠিন। মানুষের এক আদর্শ রূপের সন্ধানে ভারতীয়গণ প্রকৃতি নির্ভর ছিলেন। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোনও একজন নির্দিষ্ট নারী বা পুরুষের রূপ, আকৃতি, মুখাবয়ব ও দেহাবয়ব সর্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য কিংবা সর্বজনাকর্ষণী রূপের পরাকাষ্ঠা হতে পারে না। কারও চুল অন্য কারও চোখে ভালো লাগতে পারে, কারও কাছে বক্ষ কিংবা নাক। কিন্তু সেই ব্যক্তিরই দেহের অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের ও দৃশ্যমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি হয়তো অন্যের

দৃষ্টিতে ভালো না-ও লাগতে পারে। চোখের গড়ন-- লম্বা, টানা কিংবা ছোট; নাক-- উঁচু, স্থূল কিংবা চ্যাপ্টা; ঠোঁট-- মোটা, সরু কিংবা পাতলা; কান-- লম্বাটে কিংবা প্রশস্ত; কণ্ঠদেশ-- লম্বাকৃতি, খর্বাকৃতি কিংবা স্থূলাকৃতি-- ইত্যাদি অসংখ্য রূপের আদল মানুষের আকৃতি ও অবয়বের মধ্যে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, সমাজ, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহ্য, চাহিদা ও মানসিকতা ভেদে আলাদা আলাদা আকৃতি ও আদলের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। মানুষের হাতের ও পায়ের আঙ্গুল, জানু, নাভি, বক্ষ, উদর ও স্তনের গড়ন মনুষ্যাকৃতির পরিদৃশ্যমান ও মৌলিক রূপ সৃষ্টিতে এবং রূপ নির্ণয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের গড়নেরও কোনও সর্বজনীন মাপকাঠি নেই, কিংবা সর্বজনগ্রাহ্যতা নেই। দেশ, কাল, সমাজ ভেদে এক একটি জনগোষ্ঠী হয়ত পরস্পরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপের কথাই দাবি করবেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রে মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রিক, নিগ্রোয়েড এবং ককেশীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। ভারতীয় শিল্পী, রূপরসিক ও নন্দনতাত্ত্বিকরা হয়ত একারণেই মানুষের রূপের আদর্শ মনুষ্যলোকে খুঁজে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হননি। প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানুষ প্রকৃতিজাত, তাই মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের ও ইন্দ্রিয়ের রূপ খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রকৃতির অনন্ত রূপ-জগতেই অবগাহন ও সন্ধানের মধ্যে রূপ আবিষ্কারে সাফল্য আসতে পারে এই আশায় ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পশাস্ত্রবিদগণ প্রকৃতিমুখী হয়েছেন। প্রকৃতির রূপজগতে নিমগ্ন হলে যে রূপচৈতন্যের বিকাশ ঘটে তাই হয়ত কবির অনুভূতিতে প্রকাশ পেয়েছিল--

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু/নয়ন না তিরপিত ভেল।"

সীমিত মানুষকে প্রকৃতির অনন্ত রূপধারায় ভাবতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টি আবিষ্কারের বিরামহীন পথে মানুষের অঙ্গের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে অন্য সব জীব ও উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। মানুষের দেহের আকৃতি – তার মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট, চিবুক, বক্ষ, নাভি, কোমর, জানু, স্তন, আঙ্গুল – সব কিছুই প্রকৃতির কোনও না কোনও একটি জিনিসের মত কিংবা অন্য সকল উদ্ভিদ বা জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সদৃশ বা তাদের সাথে উপমেয়। শিল্পশাস্ত্রে এই ধরনের উপমা বা সাদৃশ্যের বহু উদাহরণ আছে। মুখমন্ডল ডিম্বাকৃতি কিংবা পানপত্র সদৃশ, চোখ খঞ্জনাকৃতি বা পুঁটিমাছ সদৃশ, নাক সরু বাঁশির আকৃতি বিশিষ্ট, অধর বিম্ব ফলের ন্যায়, স্তনযুগল দাড়িম্ব ফলাকৃতি কিংবা ঘট সদৃশ, বক্ষ গোমুখ সদৃশ, জানু উল্টো কদলীকান্ডের ন্যায়, চিবুক আম্রবীজ সদৃশ এবং আঙ্গুল চাঁপা ফুলের কুঁড়ির মত ইত্যাদি।[১]

ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় দেহের আঙ্গিক রূপের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অনেকাংশেই ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিকদের দান। মনের চরিত্র কল্পনা; তাই কল্পনার পথ ধরে নিরন্তর সৃজনক্রিয়া মনেরই স্বধর্মের পরিচয়। নারী ও পুরুষের রূপ বর্ণনায় কালিদাসের মতো কবিগণ যে সকল উপমার অবতারণা করেছেন, শিল্পশাস্ত্রকার এবং তদনুযায়ী শিল্পীগণ সেই স্তরের উপমা সদৃশ মূর্তির গঠন ও চিত্রের অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন। "উপমা কালিদাসস্য" কথাটি চিত্রকলায় সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ। কালিদাস ধ্যানী মুখমন্ডলের সাথে

বিনাবাত্যাতাড়িত নিষ্কম্প প্রদীপের আলোকশিখার তুলনা করেছেন-- নিবাতনিষ্কম্পঃ ইব প্রদীপম্" ধ্যানী শিব ও বুদ্ধের যে মূর্তি ও চিত্র ভারতে পাওয়া যায় তার অধিকাংশই এই স্তরে উন্নীত হয়েছে। বুদ্ধের ধ্যানোন্মীলিত মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এক নিস্পন্দ নীরবতা যেন প্রাণচঞ্চল দেহ, মুখমন্ডল ও মনকে সুস্থির ও সুগভীর প্রজ্ঞাবেশে নিমগ্ন ও নিবিষ্ট করে রেখেছে। স্মিত-শান্ত স্নিগ্ধতার অন্তরালে ধ্যানী মানস সত্তা যেন কোন অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে বিলীয়মান হয়ে গেছে।

দুর্গাদেবীর রূপ বর্ণনায় স্বর্ণসম শক্তির তুলনা টেনে বলা হয়েছে – "সুতপ্তকাঞ্চনগৌর - ভুবন লোচন চোর", এবং তার মুখমন্ডলকে পূর্ণ শশীর সাথে তুলনা করে শাস্ত্রকার উল্লেখ করেছেন – "গুণেন্দুপ্রভং দধৌ।" নারী ও পুরুষভেদে চোখের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে। আকর্ণবিস্তৃত স্খলিত পদ্মের পাপড়ির ন্যায় চোখ, পদ্মপলাশের ন্যায় চোখ, নারীর খঞ্জন চক্ষু, মৃগাক্ষি বা মৃগের চোখের ন্যায় চোখ, মীনাক্ষি বা মাছের আকৃতি বিশিষ্ট চোখ। আবার ধনুক-বাঁকা ভুরুর সাদৃশ্য শাস্ত্রকার তুলে ধরেছেন। নাকের বিভিন্ন আকৃতি কল্পিত হয়েছে। খগচঞ্চু বা তোতাপাখির চঞ্চু, শুকচঞ্চু এবং তিলফুলের ন্যায় নাসিকা। আবার নারীমূর্তির নাসিকা সরু বাঁশির মতই কল্পিত হয়েছে।

পুরুষের গোমুখাকৃতি বক্ষ, করিশুন্ডবৎ দীর্ঘ ও শক্তিশালী বাহু, এবং সিংহকটির ন্যায় সরু অথচ সুঠাম কোমরের কথা বলা হয়েছে। উল্টো ডিমের মত এবং পানপাতার মত মুখমন্ডল, বাঁশির মত সরু কিংবা তিলফুলের ন্যায় নাক, উল্টো কলাগাছের মত জঙ্ঘা বা জানু, সামুদ্রিক শঙ্খের ন্যায় কণ্ঠ নারীরূপের আঙ্গিক আদর্শ বলে বর্ণিত হয়েছে। কখনও নারীর মিশ্র আঙ্গিক সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। "কামের কামুক ভুরু তিলফুল নাসা/চারুশ্রুতি নিন্দিত গৃধিনী/ করিকর যুগ উরু উলট কদলীতরু/ মদমত্ত মাতঙ্গ চলনী।"[২]

অঙ্গভিত্তিক উপমা বা সাদৃশ্য বিভিন্ন হলেও এই সকল সাদৃশ্য মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। খঞ্জনচক্ষু, মীনচক্ষু, মৃগচক্ষু, পটলচেরাচক্ষু প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক তফাৎ বিদ্যমান হলেও এর প্রতিটিরই সাদৃশ্য রয়েছে বাস্তবে মানুষের চোখের সাথে। তবে পদ্মকে একাধিক অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। পদ্মলোচন (পদ্মের ন্যায় চোখ); করকমল (কমল বা পদ্মের পাপড়ি-বিকশিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট হস্ত) চরণকমল (পদ্মের পাপড়ির ন্যায় সুশোভিত আঙুল বিশিষ্ট চরণ) এবং পদ্মনাভি (পদ্মের ন্যায় সুন্দর-গভীর নাভি) – এভাবে ভিন্নাকৃতির অঙ্গের সঙ্গে একই পদ্মের সাদৃশ্য বাস্তব রূপাদর্শের কোনও সমাধান অবশ্যই নয়। এই ক্ষেত্রে উপমিত অঙ্গের লাবণ্য প্রকাশে পদ্মের সাদৃশ্য এক ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছে। তবে একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে যেসকল অঙ্গের সাথে পদ্মের উপমা কল্পিত হয়েছে তার প্রতিটির সাথে অর্ধপ্রস্ফুটিত কিংবা পূর্ণবিকশিত পদ্মের এবং তার পাপড়ির সাদৃশ্য রূপকলার দৃষ্টিতে বিদ্যমান। মনে হয় – সাদৃশ্যের এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়েই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "সাদৃশ্যের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে রূপের প্রতিরূপটি করিয়া, সোলার সাপ গড়িয়া লোককে ভয় দেখানো নয়, ঠকানো নয়, কিন্তু কোন এক রূপের ভাব অন্য কোনো

রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া।"[৩] একই যুক্তিকে সবল করতে আচার্য পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন – "চিত্রকরও দেখিতেছেন চরণকে কমলাকৃতি দিয়া তিনি না চরণ না কমল, দুইয়ের একটিকেও বুঝাইতে পারিতেছেন; এই জন্য তিনি কমলকে চরণের কাছাকাছি পাদপীঠ রূপে দেখাইয়া নিজের মনোভাবের সদৃশ করিয়া মূর্তির চরণকমল গড়িতেছেন।"[৪]

ভারতীয় চিত্রের 'সাদৃশ্য' এর আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট আমাদের অজানা। তবে সাদৃশ্যের স্বরূপ বিষয়ে অনুধাবন ও অণ্বেষণ করলে একটি দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার হয় যে 'সাদৃশ্য' স্বরূপগত প্রাকৃতিক ও বিবর্তনমুখী। প্রকৃতির বিবর্তনের এক উচ্চপর্যায়ে মানুষের আবির্ভাব, তাই উদ্ভিদ ও জীবজগতের রূপাকৃতির মধ্যে মানুষের রূপের উৎস লুক্কায়িত আছে। মহাবিশ্বপ্রকৃতির ঐকিক প্রাণছন্দের অংশ মানুষ, তাই তার অঙ্গের স্বরূপ, ছন্দ ও 'প্রমাণ' প্রকৃতির অন্যসকল জীবের আঙ্গিক বিকাশেও অলক্ষিত হবার নয়। মানুষের আঙ্গিক ও সার্বিক রূপবিকাশ প্রকৃতির অনন্ত ও অসীম রূপের প্রকৃতিতে আছড়ে পড়েছে। ভারতীয় চিত্রকর, শিল্পশাস্ত্রকারও মানুষের মৌলিক রূপের সেই সন্ধান প্রকৃতিতে করেছেন।

সাদৃশ্যের প্রেক্ষাপট ও উত্তরপটে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে একটি আবেগোচ্ছল দিকও আছে। মানুষ যখন ভাবতে শিখবে যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ-সদৃশরূপ প্রকৃতিতে অন্য জীবের ও বস্তুর মধ্যেও রয়েছে তখন তার মধ্যে প্রকৃতির সাথে নীরব একাত্মতা অনুভবের এক অন্তস্থিত প্রেরণা তৈরি হবে। এ প্রেরণা শিক্ষামূলক বা কৃত্রিম নয়। প্রকৃতির অংশ হিসেবে এরকম মনোভাব সতত অন্তরোৎসারিত, তবে শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশে মানুষ প্রকৃতির সাথে তার একাত্মতাকে বিস্মৃত হয়। তেমন ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্রকলার সাদৃশ্যের দর্শন মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে এক অখন্ড ও অবিভাজ্য প্রকৃতির অংশ এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপাকৃতি ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির বিভিন্ন জীবে – এখানে-সেখানে-সর্বত্র। সে কারও থেকে স্বতন্ত্র বা আলাদা নয়; এ বিশ্বে সে একাও নয়।

২) ভারতীয় মার্গচিত্র প্রতীকাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী ঃ

ভারতীয় চিত্র যেমন প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নির্ভর, তেমনই প্রতীকাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী। শুধু শিল্পের জন্যই শিল্প (Art for art's sake) – ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের মূলকথা অবশ্যই নয়। প্রতীক নির্ভর জীবনের এক মহৎ আলোকবর্তিকা বা দৃষ্টির ধ্রুবরূপে চিত্রবস্তুর কল্পনায় ও অঙ্কনে তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম দৃষ্টিচেতনাকে প্রজ্ঞালোকের অসীম দ্বারে বিকশিত করাই ছিল চিত্রকলার এক বিশেষ উদ্দেশ্য। জীবন ও জগতকে এক সূত্রে বাঁধতে গিয়ে চিত্রের মহত্ত্ব নিঃসৃত হয়েছে জীবলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকের এক অখন্ড সত্তার উন্মোচনের ধ্যানে। সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞারূপ প্রতীক মাধ্যম চিত্রে এক আদর্শের

কল্পবৃক্ষ প্রোথিত করেছে মানুষের উন্নয়নী চারুচেতনার বিকাশের অনবদ্য ধারাবাহিকতায়। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অনুভবের পথে মানুষ তার নিজের আপাতবাহ্য সীমিত অস্তিত্বের পরিগণ্ডী অতিক্রম করে-- আত্মবিকাশের সমস্ত বাধাকে ছিন্ন করে নিজের স্বরূপকে জানতে চায়, বিচলিত হয় অনন্তের সাথে তার কোনও নিরন্তর সম্পর্ক আছে কিনা সেই রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে। চেতনা বিকাশের এই অনন্ত ও বিরামহীন পথে অনন্ত রূপকে লক্ষ্য করেই মানুষ এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অনন্ত ও অসীম তার সীমিত ধারনার পারাপার। তাই অসীম ও অনন্তকে সে সসীম রূপকের বা প্রতীকের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চায়। কবির ভাষায় – "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" সেই অসীম সত্তার সসীম সুর ও রূপধারাকে চিত্রের প্রতীকরূপ আকৃতি ব্যঞ্জনা ও ছন্দে শিল্পী প্রস্ফুটিত করার প্রয়াসে আনন্দিত হতে চান, আর নন্দিত করতে চান তার নিহিতার্থের সমঝদারদের। তাই ভারতীয় চিত্রের নিহিতার্থ অনুভব করতে হলে চিত্রস্থিত প্রতীকধর্মী আদর্শের বিস্মরণ অসমীচীন হবে।

ভারতের আদর্শ রূপকল্প সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যান, এক অখন্ড ব্রহ্মের ধ্যান, এক অবিভাজ্য মহাবিশ্বের ধারণা, প্রকৃতি এক এককের ধারণা। এই সকল ধারণাই লয় পায় এক অখন্ড চেতনা সমুদ্রে। কিন্তু ইন্দ্রিয় চেতনায় অখন্ডকে খন্ড না করলে, স্তর বিন্যাস না করলে তার কোনও গ্রাহ্য রূপ অনুভূত হয় না। তাই সীমার জগতে এই অখন্ডের স্তরবিন্যাস রূপের ধ্যান ও আরাধনাকে আশ্রয় করে সীমিত ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মহৎ চেতনালব্ধ আশা ও আনন্দের বর্তিকা জ্বালিয়ে রাখার জন্যই। সে উদ্দেশ্যেই কল্পিত হয়েছে সীমিত জীবনে অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর, প্রতীয়মান হয়েছে নির্গুণের সগুণ বিকাশ ও দ্বৈত সত্তা – সপ্তলোক ও সপ্ততল, স্বর্গ ও নরক, সুর ও অসুর, আলো ও অন্ধকার, শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা, জড় ও জীব, চেতন ও অচেতন, দেব ও দৈত্য, মোহ ও মুক্তি, অজ্ঞানতা ও প্রজ্ঞা, শিক্ষা ও অশিক্ষা, সুপথ ও কুপথ, বন্ধন ও নির্বাণের ধারণা।

দ্বৈত-রূপের পরস্পর বিরোধী অধোগামী ও ঊর্ধ্বগামী দুই প্রান্তে অন্ধকার ও আলোকের, মৃত্যু ও অমৃতের, সত্য ও অসত্যের, বেসুর ও সুরের, বিশৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলার, দানব ও দেবের মোহ ও মুক্তির স্থান। এক প্রান্ত নঞর্থক, বিপরীত প্রান্ত সদর্থক। মানুষের স্থান আলো ও অন্ধকারের ছায়াতলে আলো-আঁধারি কুহেলিকা ও মায়াচ্ছন্ন অস্পষ্টতায় মগ্ন হলেও আত্মবিকাশের বিবর্তনের পথে মানুষ জ্যোতির্ময়লোকের পূজারী। তার ঊর্ধ্বগামী ধ্যান সদর্থক জগতের প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে চিরশান্তি ও নির্বাণের পথে গতিলাভ করে। ভারতীয় চিত্রকলায় দ্বৈতসত্তা নঞর্থক ও সদর্থক দুই ধারাকেই রূপ-কল্প-প্রতীকে চরিত্রায়িত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে। চিত্রে দেব ও দেবী রূপ প্রতীকার্থেই দানব ও দৈত্য রূপ থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক।

ভারতীয় ধ্যানে ব্রহ্ম-কল্প-পুরুষকে জ্যোতির্ময় ও জ্ঞানময় বলে ভাবা হয়েছে –

"বেদাহমেতং পুরুষ মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাত"

এই সদর্থক ধ্যানরূপ চিত্রকল্পের সৃষ্টিকারী। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি – বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীকে সূর্য ও চন্দ্রের মতই দেবত্ব আরোপ করে চরিত্রায়িত ও চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাদের আকৃতি, বর্ণ, অস্ত্র ও বাহন সব কিছুই প্রতীক-প্রভ। রূপের উৎস বিচারে পবনদেব, ইন্দ্র, অগ্নিদেব, বসুধা, সূর্যদেব ও বরুণের চিত্রকল্প প্রতীকাশ্রয়ী।

চিত্রকল্পে সদর্থক প্রতীকের বিকাশের বিবর্তন প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি-প্রভ প্রতীকের পরিসীমা ছাড়িয়ে ধ্যানলোকের আরাধ্য জ্ঞানময় প্রতীকের রূপভেদ সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে ধ্যানী শিব, নটরাজ, শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম-শিলা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা, কালিকা, সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞান প্রতীকের – যাদের স্থান প্রকৃতির শক্তি-প্রভ প্রতীকেরও ঊর্ধ্বে; এবং নিহিতার্থ উপলব্ধিপূর্বক যাদের ধ্যান মানুষের চেতনার উত্তরণ ঘটায় বেসুর থেকে সুর সমণ্বয়ের জগতে, অন্ধকার থেকে আলোর জগতে, মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে অমৃতময় এক পরম অস্তিত্বের সন্ধানে। প্রতীকার্থ উপলব্ধির যুক্তিতে এই সকল প্রতীকী মূর্তিতে ফুল, বেলপাতা ও প্রসাদ দিয়ে পূজা করার কোনও সার্থকতা নেই। প্রতীকের অর্থানুভব এবং তদনুযায়ী জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রয়াসেই নিহিত আছে সার্থকতা। তবে ফুল, বেলপাতা ও প্রসাদও প্রতীকস্বরূপ; এদের অর্থ মনোজগতে, বাহ্যিক নয়। হৃদয়-পদ্ম (ফুল) ও ত্রিনয়ন-স্বরূপ ত্রিপত্র বিশিষ্ট বেলপাতা জ্ঞান ও প্রতীক স্বরূপ দেব ও দেবীর নিহিত অর্থে ধ্যানাবিষ্ট হলেই প্রজ্ঞাভিষ্ট-রূপ প্রসাদ লাভ হয়। দেব প্রতীকের সম্মুখে স্থিত জলঘট আত্মপরিশ্রুতমান, সমতা রক্ষাকারী, চির গতিশীল জীবন-স্বরূপ পবিত্র জল ধ্যায় প্রতীকের অর্থে স্থাপনও অভীষ্ট লাভে অপরিহার্য। তাই ফুল বেলপাতা, জলঘট কোনওটিই বাইরের বস্তু নয়, অন্তর্জগতেরই সম্পদ যার প্রদানেই জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ হয়।

বেদ ও বেদাঙ্গ ভিত্তিক এই সকল দেব প্রতীক ও জ্ঞান প্রতীকের কল্পনা মানুষের অস্তিত্বের উন্নয়ন ও আত্মবিকাশে সহায়ক হতে পারে শুধু তাদের কাছেই, যারা প্রতীকের অর্থ নিষ্কাশনে মনোনিবেশ ও ধ্যান করেন। জ্ঞান প্রতীকের এই কল্পনার ধারা ও ঐতিহ্য সময়ান্তরে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রকৃতি ও মনোজগতের দ্বৈতসত্তার রূপ বৌদ্ধ তাত্ত্বিকেরা প্রতীকাশ্রয়ী করে চিত্রায়িত করেছেন। নির্বাণের পথে মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরের বাধাগুলিকে যেমন 'মার' রূপে প্রতীকার্থক করে তুলেছেন, তেমনই বুদ্ধের বিভিন্ন রূপ কল্পনায় এবং তাঁর মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য সত্তার প্রতীককে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বুদ্ধের বিভিন্ন অবতার ও রূপকে চিত্রিত করেছেন। এভাবেই বৌদ্ধ চিত্রকলায় অস্তিত্বে এসেছিল দানবরূপী 'মার' ও দেবতুল্য পরম করুণাময় ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। সর্বদুঃখত্রাতা করুণাঘন বুদ্ধের এক রূপ ফুটে ওঠে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মধ্যে; এবং একই ধারায় স্বর্গের বিভিন্ন স্তরের ধারণা এবং আদিবুদ্ধ ও বুদ্ধ অমিতাভের প্রতীকরূপী কল্পনাও বৌদ্ধ সাহিত্য ও চিত্রকলার জগতকে সমৃদ্ধ করে। বুদ্ধের অনন্ত শক্তিও দেবী প্রতীকে 'তারা' নামে খ্যাত হয়। প্রতীক নির্ভর বোধিসত্ত্ব ও বৌদ্ধ দেব-দেবী শুধু ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে বাংলার

পাল যুগের চিত্রকলাতেই প্রাধান্য পায়নি; জ্ঞানপ্রতীক ও করুণার প্রতীকরূপে এ সকল দেবদেবী ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি সুদূর প্রাচ্য ও তিব্বতের চিত্রের বিকাশ শ্রীবৃদ্ধি ও ইতিহাসকেও অভূতপূর্ব প্রভাবিত করেছে।

প্রশ্ন হল দেবদেবীর চিত্র প্রতীকগুলিকে জ্ঞান প্রতীক হিসেবে এখানে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা কি? যৌক্তিকতা নির্দেশে পরিষ্কার বলা যায় যে প্রতীকগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ধ্যানে ও অনুসরণে ব্যক্তিমনের নৈতিক বিকাশ ঘটে। যেমন সরস্বতী জ্ঞানদেবী রূপে কল্পিত হয়েছেন; এবং বিদ্যার্থীগণ দেবীর অর্চনা করেন। সরস্বতীরূপ জ্ঞান প্রতীক ব্যাখ্যায় বিদ্যার্থীর সহায়ক বিষয়গুলিকেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। সরস্বতী কমলে উপবিষ্টা এবং কমলের চরিত্র অন্ধকাররূপ অজ্ঞানতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং জ্ঞানরূপ আলোর জগতের আগমনে বিকশিত হওয়া। দেবী হংসারূঢ়া, হংস চরিত্র জল থেকে দুধকে আলাদা করে নেবার মতই বিশ্বে শুধু গ্রহনীয় জ্ঞানরূপ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং অসৎ ও অগ্রহনীয় বস্তুকে বর্জন করা। দেবীর বীণা সুর সমণ্বয়, জীবনের সদর্থক ছন্দ ও শৃঙ্খলার প্রতীক। দেবীর বস্ত্র, দেহ, শঙ্খ, পদ্ম ও হংসের শুভ্রতা পবিত্রতা, সততা ও পরিপূর্ণতার প্রতীক। যদি কোনও বিদ্যার্থী দেবীর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে তার পক্ষে জ্ঞানাণ্বেষেণের অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হবে।

সমস্ত সুরের, দেব প্রতীক ও জ্ঞান প্রতীকের নিহিত শক্তি সমণ্বয়ে আবির্ভূতা সকল সুরের পরমা সুর দেবী দুর্গা পরা ও অপরা প্রকৃতির, সৃষ্টি ও স্থিতির, সকল সুর, ছন্দ ও চেতনার (শিবের) শক্তিধারিনী। তিনি অজ্ঞানতা ও অন্ধকার রূপ নঞর্থক অসুর নিধনকারিনী। এই পরমা সুরসমণ্বয়ী দুর্গাই মহাশক্তিধারিনী কালিকারূপে সমস্ত বেসুর, অসুর, বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারকে দূর করে পরম পবিত্র চিরশুভ্র সত্তা স্বরূপে চেতন-সমুদ্র (শিব) এর অন্তরে (বক্ষদেশে) সকল গতির সঞ্চারিনীরূপে অবস্থান করেন। আবার মহাচেতন-সমুদ্র-শিব দ্বৈত প্রকৃতির সমস্ত নঞর্থক দিক কালকূটরূপ বিষ – অজ্ঞানতা ও অন্ধকারকে – নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় করে কণ্ঠে ধারণপূর্বক সৃষ্ট জগতে সকলের জন্য গঙ্গারূপ মুক্তি ও নির্বাণের পথ উন্মোচিত করেছেন। আবার এই মহাচেতন সমুদ্র যখন আপন সৃষ্টিক্রিয়ার প্রাণছন্দে ও তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হন, তখনই তিনি স্বপ্রকাশিত হন সৃষ্টি-কম্পন-ধারা, সৃষ্টিনৃত্যকারী নটরাজ শিব রূপে। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও জ্যোতির্লিঙ্গ এই পরম চেতন সমুদ্র বা চেতনাকাশ রূপ শিবেরই বিভিন্ন প্রতীক। শৈবদের কাছে শিবের যে স্থান, বৈষ্ণবদের কাছে বিষ্ণুরও সেই স্থান। রাধিকা প্রকৃতির হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপিনী। তিনি সত্তাস্বরূপ বিষ্ণুর পরম-চেতনাকাশ নিষ্কৃত অনাহত নাদের বা সুরের (বাঁশির সুরের) নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আত্মনিবিষ্টা। তাৎপর্য এই যে, সুর, ছন্দ, তাল ও শৃঙ্খলাবিহীন প্রকৃতির কোনও অস্তিত্ব নেই। ভারতীয় চিত্রকলায় এই সকল দেবপ্রতীক ও জ্ঞানপ্রতীকের সন্নিবেশ ও সমাবেশ মানবজীবনের এক পরম আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। সে আদর্শের লক্ষ্য হল মানব জীবনের মহৎ ইষ্ট ও অভীষ্টকে লাভ করা।

উপরি উক্ত আলোচনার নিরিখে ভারতীয় চিত্র বিষয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ঃ

১) ভারতীয় মার্গ চিত্রকলায় শিল্পের জন্যই শিল্প (Art for art's sake) এই যুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি।

২) 'শিল্পের জন্যই শিল্প' না হলেও ভারতীয় মার্গ চিত্র আবার বাস্তবিক পক্ষে সমাজায়ত নয়। সমাজের সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না এবং জীবন সংগ্রামের কাহিনিকে নির্ভর করে চিত্র বিষয় ভাবিত হয়নি। শুধু আধুনিক যুগ উন্মোচনে ঊনিশ শতকের শেষ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পী-সাধারণ ভারতীয় জনগণের জীবনধারা ও জীবনসংগ্রামের দৃশ্যকে কিয়দংশে চিত্রে রঙ তুলিতে মর্যাদা দিয়েছেন। অনেকে মোঘল যুগের চিত্রকে ধর্মীয় প্রভাব বিরহিত চিত্র বলে দাবি করেন। সে দাবির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখিয়েও বলা যায়, মোঘল চিত্র ছিল রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারি চিত্র। সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য স্থান সেখানেও হয়নি।

৩) বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বলা যায় ভারতীয় মার্গ চিত্রের বৃহদংশ ছিল প্রতীক প্রধান ও আদর্শাশ্রয়ী।

৩) শিল্পশাস্ত্র নির্ভর চিত্রকলা ঃ

ভারতীয় চিত্রাঙ্কনে শিল্পশাস্ত্রের অনুকরণে শিল্পীর একনিষ্ঠ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য। মার্গ-চিত্রের শিল্পীগণ সাধারণত স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুলি চালাতে পারেননি। শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম, ব্যাকরণ ও পদ্ধতি অনুসরণ আবশ্যক ছিল। তবে এতে একঘেয়েমির অবকাশ ছিল না। কারণ ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র বস্তু, মানুষ ও জীবভেদে আকৃতির মৌলিক ব্যবধান; অঙ্গের মাপ, মাত্রা সামঞ্জস্য; রেখার প্রাণছন্দ; ভাব, ভঙ্গি ও রঙের ভিন্নতায় অতুলনীয় ও অপরিমেয় বৈচিত্র্যের পরিসরের বিস্তার ঘটিয়েছে। বাৎস্যায়ন্ কৃত কামসূত্রের টীকাকার পন্ডিত যশোধর চিত্রকলার যে ছয়টি অঙ্গ বা ষড়ঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন তা চিত্রাঙ্গ বিন্যাসের নিমিত্ত কলাক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রগণ্য অন্য যে কোনও দেশে প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতির নিরিখে প্রশংসনীয়। ষড়ঙ্গের শ্লোকটি এদেশে বহুল প্রচলিত ঃ

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাব লাবণ্যযোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকভঙ্গ ইতি চিত্র ষড়ঙ্গকম্।।"

কুকুরের আকৃতি ঘোড়ার মত নয়, কলাগাছ আম গাছের মত নয়, আকাশ সমুদ্রের মত নয় – ইত্যাদি বস্তুর স্বাতন্ত্রভেদে আকারগত পার্থক্য ও রূপভেদ অনুযায়ী হয়ে থাকে। কাদা, বালি, মাটি, জল, পাথর প্রভৃতির ভিন্নতা; কোমল, কঠিন, সরু, চিক্কন, চ্যাপ্টা, মোটা, গোল ইত্যাদি বস্তুর ভিন্নমুখী আকারগত বিশেষণ রূপভেদ জ্ঞানের মাধ্যমেই চিত্রে উপস্থাপন সম্ভব। একই চিত্রক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্রবস্তুর ও বিষয়ের মাপ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও গভীরতা; চিত্রিত বিষয়ে পারস্পরিক দূরত্ব ও নৈকট্য প্রভৃতি 'প্রমা' বা প্রমাণের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বস্তুত প্রমা হল রূপ ও আকৃতির পরিমিতি। চিত্রক্ষেত্রে আকাশ, বাতাস, মেঘ, সমভূমি, বনানী, পাহাড়, নদী, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আকারগত, রূপগত ও মনোগত ভাব, ভাবের পরিবর্তন ও ব্যঞ্জনাই হল 'ভাব'।

প্রমাণের পরিমিতি ভাব। বর্ষার গুরুগম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ভাব বৈশাখের আগুন ঝরা আকাশের ভাবের চেয়ে আলাদা। চিত্রে হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনার অভিব্যক্তি বিভিন্ন ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

ভারতীয় চিত্রে মনোগত ও প্রকৃতিগত ভাবের লক্ষণ ব্যতীত দেহভঙ্গি ও হস্তভঙ্গিও দৃষ্টান্তমূলকভাবে বিবিধ ভাবের বহিঃপ্রকাশে তাৎপর্যপূর্ণ। দেহভঙ্গি ও হস্তমুদ্রার এত বহুল, বিচিত্র ও ব্যবহারিক প্রচলন পৃথিবীর অন্যদেশে বিরল। দেহভঙ্গিগত ভাব আবার দন্ডায়মান ও উপবিষ্ট অবস্থা – এই দুই ভাগে বিভক্ত। চিত্রে সজীবতা, প্রাণস্পন্দ, দেহের গতি ও মনের গতি বোঝা যায় দেহভঙ্গিতে। ভঙ্গ, আভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ – এই সকল দেহভঙ্গিকে সাধারণত নৃত্যের ছন্দ ও ভাষা এবং অভিনয়ে ভাব ও ভাষার ইঙ্গিত হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় ভঙ্গি প্রকাশ পায় বিভিন্ন যোগাসনে। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, শবাসন ইত্যাদি আসনগুলিতে দেহের ক্রিয়া ও মনের অবস্থান নির্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধ পদ্মাসনে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা ধারণ করে আছেন। এতে বুদ্ধের মন, ক্রিয়া ও দৃঢ় চিত্ত-নিবেশে পরিষ্কার বোধগম্য হয়। দেহের ভাবের সাথেই মনের ভাবও রূপাকৃতিতে ব্যঞ্জনা লাভ করে। হস্তভঙ্গি সাধারণত মুদ্রার মাধ্যমে বিকশিত হয়। অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, শঙ্খ, চক্র, সম্পূট, শকট, কর্তরস্বৈস্তিক, কটকাবর্ধন, স্বস্তিক, পুষ্পপূট, শিবলিঙ্গ, নাগবন্ধ, খট্টা, ভেরুন্ড, কূর্ম, বরাহ, গরুড়, পাশ, কীলক, মৎস, মৃগশীর্ষ, সিংহমূল, কাঙ্গুল, অলপদ্ম, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড়, ত্রিশূল, ময়ূর, অর্ধচন্দ্র, আবাল, শূকতুন্ড, ব্যাঘ্র, ঊর্ণনাভ, বাণ, পতাক, ত্রিপতাক, অর্ধপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধসূচী, সূচী, কটক, পল্লী, চন্দ্রকলা, পদ্মকোষ, সর্পশীর্ষ, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, বরদা, অভয় প্রভৃতি মুদ্রা বা হস্তভঙ্গিগুলি বস্তুতপক্ষে প্রতীকী এবং এরা মনের ভাষাকে ও চিত্তের গূঢ়ার্থকে হাতের তালু ও আঙ্গুলের বিভিন্ন শোভনীয় ও বৈচিত্র্যময় অবস্থানে প্রস্ফুটিত করে তোলে। তাছাড়া এই মুদ্রাগুলি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বস্তু, ভাব ও আকৃতির প্রতিরূপ নির্দেশ করে। মুদ্রাগুলি অধিকাংশই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের এবং জীবজন্তুর আকৃতির ইঙ্গিত বহন করে। অঞ্জলি, বরদা, অভয়, মুকুল, ত্রিশূল, বাণ, সূচী ও চন্দ্রকলা-- এই মুদ্রাগুলি ভারতীয় চিত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

চিত্রবিকাশে ভাবের চারটি অঙ্গ প্রতীয়মান হয়, যথা – প্রকৃতিগত ভাব, মনোগত ভাব, দেহভঙ্গিগত ভাব ও হস্তমুদ্রাগত ভাব। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল নীলিমা, ঝঞ্ঝাতাড়িত বনানী, শান্তস্নিগ্ধ জলরাশি, তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ক্ষিপ্ত সমুদ্র, বায়ু আন্দোলিত সবুজ শস্যক্ষেত্র, কুয়াশাচ্ছন্ন কিংবা বৃষ্টিস্নাত দিন-- এর সবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগত ভাবের বহিঃপ্রকাশ এবং চিত্রে এই ভাবগুলিকে রঙ ও রেখায় পরিস্ফুট করে প্রাকৃতিক ভাবকে রূপ দেওয়া যায়। হাসি, কান্না, প্রসন্নতা, গাম্ভীর্য, মলিনতা প্রভৃতি ভাবের অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা যা চিত্রায়িত মানব মানবীর মুখমন্ডলে রঙ ও রেখায় ফুটে ওঠে তাই হল মনোগত ভাব। দেহভঙ্গি ও হস্তভঙ্গি বা মুদ্রার মাধ্যমে যে ভাব ফুটে ওঠে তার দ্বারা মনের গতিকে বোঝা যায়।

প্রমাণ যেমন রূপভেদের সীমা নির্ণয় করে, ভাব যেমন 'প্রমা'র পরিসীমা এঁকে দেয়, তেমনি ভাবের সুস্থ, স্বাভাবিক ও মনাকর্ষণী পরিমিতি নির্ণয় করে লাবণ্য। লাবণ্য প্রকারান্তরে রূপভেদ, প্রমাণ ও ভাব সবকিছুকেই সুরুচিপূর্ণ ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে মনোহর রূপ বিকাশের বিভিন্ন মাত্রাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে। এই লাবণ্য আবার রঙের মাত্রাকেও নির্ণয় করে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছবি আঁকতে গিয়ে কোন রঙের কতটুকু ঢেউ দেখালে আকাশ ও মেঘের মিলন ও অস্তিত্ব বোঝাবে তা লাবণ্য বিকাশের উদ্দেশ্যেই এবং ভাবের পরিসীমা টানার জন্যই প্রয়োজন। দেহভঙ্গিতে অতিভঙ্গ আছে, কিন্তু ভঙ্গি যেন সম্ভাব্য মাত্রা ছাড়িয়ে একটি অর্থহীন বিকৃতি প্রকাশ না করে। ভাব বিষয়ে এই পরিমাণ লাবণ্য বিষয়ে চেতনারই ফসল। লাবণ্য চিত্রকে আকর্ষণীয়, মোহনীয় ও মনোহর করে তোলে। তাই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "চিত্রের সমস্ত ভাবভঙ্গিতে লাবণ্য একটি শীতলতা শোভনতা দিয়া চিত্রটিকে নয়নস্নিগ্ধকর ও মনোহর করিয়া তোলে।"[৫]

বর্ণিকাভঙ্গ হল রঙের বিন্যাস, বর্ণভেদ, বর্ণগভীরতা (টোন), বর্ণবিভাগ এবং রঙের মাত্রা প্রভৃতি। বর্ণরেখায় ও রেখায় বর্ণের খেলায় ছন্দ ও রূপ বিকশিত হয়। আলোর জগতে বর্ণের অসীম খেলা রূপবিকাশের বাহন। কাঁচা আমের রঙ পাকা আমের মত নয়, অলক মেঘ কিংবা তুলা মেঘের রঙ বাদল মেঘের রঙের থেকে আলাদা, গভীর সমুদ্রের রঙ সৈকত-সমুদ্রের মত নয়। বস্তুভেদে – বস্তুর নাম ও রূপভেদে – ঋতুভেদে, পরিবেশভেদে রঙের যে ব্যবধান হয় তাই বর্ণিকাভঙ্গ। কী রঙ দিতে হবে, কতটুকু দিতে হবে, রঙকে কোথায় কতটুকু ভাঙতে হবে, উজ্জ্বল করতে হবে বা ক্রমাবলুপ্ত করতে হবে এবং সে রঙের মিশ্রণ কীভাবে তৈরি হবে – তা সবই বর্ণিকাভঙ্গের জ্ঞানের জন্যই সম্ভব।

সুরাশ্রয়ী ঃ

ভারতীয় চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ গৌরবময় বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতের সুরকে কেন্দ্র করে চিত্রাঙ্কন। রাজস্থানী ও কাংড়া চিত্রমালায় সুরাশ্রয়ী চিত্রের আধিক্য লক্ষ্যনীয়। শিল্পীর শিল্পসত্তায় বিশ্বপ্রকৃতি অপরূপ রূপ মাধুরী নিয়ে প্রবেশ করে। শিল্পীর অন্তরের ধ্যানালোকে এই রূপ অতিন্দ্রীয় আবেশ সৃষ্টি করে শিল্পীকে আবিষ্ট করে। অনুভবের এই রূপলীলা প্রকাশে শিল্পী হয়ে ওঠেন চঞ্চল। প্রকৃতির মধ্যে নদীর কলতান, পত্রের পতনজাত মর্মর ধ্বনি, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির পতন, বায়ুতাড়িত বনস্থলী, ঝঞ্ঝা – সর্বত্রই অনুভূত হয় যে ধ্বনি, সেই ধ্বনিকেই সুরে তরঙ্গায়িত করে তোলেন সাধক। বিশ্বের অনাদি অনন্ত এই নাদকে ভারতীয় ঋষি ব্রহ্মস্বরূপ কল্পনা করেছেন। অনুভবকে বা ধ্যানকে মূর্তিমান করে তোলা ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্য। 'ধ্যায়েৎ শূন্যং অহর্নিশম্' – এই মন্ত্রের অনুগত হয়ে আমরা যতই শূন্যের ধ্যান করিনা কেন তা মানসপটে ভেসে ওঠা একখন্ড নীলাকাশ ছাড়া তো আর কিছু নয়। অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অসীমের ব্যঞ্জনা। আবার এই অসীমকেই সসীমতায় ফুটিয়ে তোলেন ঋষি ও শিল্পী তথা কবি। তাই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত শক্তি দেবতারূপে

রূপ পরিগ্রহ করেছে ভারতীয় ঋষির কল্পনায়, বর্ণনায়, তুলিকায় ও প্রস্তরগাত্রে। বায়ু আকৃতি নিয়েছেন পবন দেবতায়, জলের দেবতারূপে বরুণ, মেঘের দেবতা ইন্দ্র আর আগুনের দেবতারূপে অগ্নি। তেমনই বিশ্বের বিচিত্র শব্দতরঙ্গও সুরধ্বনির মাধ্যমে সংগীত শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী। সৃষ্টির মূলে যে নারী ও পুরুষ, মনে হয় সুরের গাম্ভীর্যে ও কোমলতার নিরিখে তা রাগ ও রাগিনীতে নির্দিষ্ট হয়েছে। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনে অনুরণিত হচ্ছে পৌরুষতা। নদীর সুমিষ্ট কলতানকে নারী সুর ছাড়া পুরুষ স্বর রূপে ভাবা যায় না। সঙ্গীতের পুরুষ এই ছয় রাগ হলেন – ভৈরব, মেঘ, পঞ্চম, নট্টনারায়ণ, শ্রী এবং বসন্ত রাগ। এদের প্রত্যেকের ছ'জন করে পত্নী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালশ্রী, ত্রিবণী, হিন্দোলী, গুর্জরী, ভৈরবী, তোড়ি, দেবকিরী, ললিতা, মধুমাধবী, মল্লারী, পাহাড়ি, দেশী প্রভৃতি।

মানুষের আবিষ্কৃত ও সংকলিত সুর প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহ ও ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে তার মনের সংঘাত ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই উৎসারিত হয়েছে। এই স্বাভাবিক সুরোৎসারণের কারণ হল – এই জগতের যা কিছু তা সব প্রাণছন্দে কম্পমান এবং এই কম্পনের শৃঙ্খলা, সমণ্বয় ও তালই সুর; এবং বেতালই অসুর। বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তিই হল সর্বপ্রাণময়তা ও শৃঙ্খলা। এক এক ঋতুতে এই প্রাণছন্দের উত্থান ও পতন ঘটে, বদলে যায় জীবজন্তুর মনের ভাব, মনের সুর ও প্রকৃতির রঙ। তাই রঙের সাথে সুরের সমণ্বয় আছে। সাদা রঙ শুচিতা, শান্তি, পূর্ণতা, প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের প্রতীক; সবুজ – জীবন ও যৌবনের প্রতীক; আবার গৈরিক (পাংশু ঝরাপাতার রঙ বলে) ত্যাগের প্রতীক; নীল রঙ অনন্ত আকাশ ও সমুদ্রের রঙের সদৃশ বলে চিরন্তনতা ও অসীমের প্রতীক। নীল অনন্তকে স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের মনে এবং অহং ও সংকীর্ণতাবোধ ধ্বংস করে। লাল রঙ রাত্রিরূপ অন্ধকারের পর রক্তবর্ণ ঊষার প্রতীক।[৬] ধ্বংসের বিরুদ্ধে সৃষ্টি ও শুরুর প্রতীক লাল। তাই কালিকা করাল-রূপিনী বেতাল ও অসুর ধ্বংসকারিনী হলেও রক্তরাগে রঞ্জিতা নবসৃষ্টি ও জীবনের প্রতীক। ঋতুভেদে সবুজ বর্ষার প্রতীক, হলদে বসন্তের, পাংশু গৈরিক শীতের প্রতীক। নীল ও সাদা শরতের প্রতীক। প্রাণছন্দ জীবজন্তু, লতাপাতা, পর্বত, সমুদ্র, আকাশ, বাতাস – বিশ্বের সবকিছুকে এক সূত্রে বেঁধেছে। প্রাণে নিহিত ছন্দ তাল ও সুরকে ফুটিয়ে তোলে। প্রাণের ছান্দিক বিকাশই সুর। সুর ভাবসমণ্বিত এবং সুর রঙ-সমণ্বিত। তাই হাসি কান্না, সুখ ও দুঃখের যেমন সুর আছে, তেমনি তার রঙও আছে।

সুখ ও দুঃখের ক্ষণউদয় ও প্রস্থান ছাড়া ঋতু পরিবর্তনের সাথে মানুষের মনের ভাব ও সুরের ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান। ঋতুচক্রের গতিপথে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে পরিবর্তন হয় তার গভীর আবেদন ঝংকৃত হয় মানুষের মনে। অন্তরের ঝংকৃত ভাব গভীরতর হয় মননে, মুক্তি পায় আপন মনের সুর ভজনে, বিস্তৃতি লাভ করে চর্চায় ও সাধনায়। এই সুর যেন প্রকৃতির গতিশীল ও সদাচঞ্চল আচরণের দান, যার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়েছে অনাদিকাল থেকে। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনে সুর শুধু মানুষের মনেই অনুরণিত হয় না, সে সুর ফুটে ওঠে অন্য সকল জীবের আচরণেও। বরং মানুষ অজ্ঞাত কিংবা স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রকৃতির প্রতি ভাবের

প্রতিক্রিয়ায় জীবজগতের আচরণকে নকল করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ প্রকৃতির পরিবর্তন মানুষের চেয়ে অন্য জীবেরা অনুভব করে কোনও মাধ্যম ছাড়াই প্রত্যক্ষভাবে, এবং মানুষের অনেক আগে। জীবের আচরণ, কখনও অস্বাভাবিক আচরণ, আমাদের সচকিত করে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে। ভারতীয় সুর সাধকরা ঋতু ও পরিবেশ ভেদে সুর রচনা করতে গিয়ে নিজেরা প্রকৃতির পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়েও সুর রচনা করেছেন। আবার অন্য জীবের আচরণ লক্ষ্য করে সেই সকল জীবকে অনুকরণ করেও সুর রচনা করেছেন। কোকিল বসন্তে গান গায়, ঊষার উদয়ের পূর্বে পাখির কলরবে মানুষের ঘুম ভাঙে, গ্রীষ্মে চাতক ডাকে, রাতের নির্জনতায় কোনও কোনও পাখির ডাক ভেসে আসে, বর্ষায় নদীর কুলু কুলু ধ্বনি চৌদিক নিনাদিত করে, বাতাসের শন্‌শন্ আওয়াজ সবুজ বনানীকে প্রকাশিত করে, কালবৈশাখীর মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন আকাশ ভরে দেয়, আবার বর্ষারম্ভে ভেকের সম্মিলিত গান সে ঋতুর আগমন বার্তা ঘোষণা করে। গভীর বনানীতে বর্ষার ঝুপঝুপ্ আওয়াজ শীতের মর্মর ধ্বনির সাথে যেন সম্পর্ক বিরহিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ রব আঁধারের নীরবতাকে বিশেষিত করে। পশুপাখির এই ধ্বনির প্রতিক্রিয়া কিংবা সঙ্গীত ঋতু ও প্রকৃতির পরিবেশের সাথে সমন্বিত। ভারতীয় সুরকারগণও ঠিক তেমনই ঋতু ও কালিক ভাব, পরিবেশ পরিবর্তনের ছন্দ, তাল ও লয়কেই তাদের সুরে সংকলিত করেছেন। বসন্তে কোকিলের সুর, বর্ষায় ভেকের গান ও মেঘের গর্জন, বৈশাখে চাতকের আর্ত করুণ সুর, শীতের হিমানীতে শৃগালের চীৎকার, রাতের গভীরে পেঁচকের ডাক, কাকভোরে কাকের কলরব, ঊষাগমে পাখির কূজন, ফুলের উদ্যানে ভ্রমরের গুঞ্জন প্রকৃতির কালিক ও সাময়িক সুরকেই যেন ব্যক্ত করেছে। ঋতুর পরিবেশে মানুষ যেন জীবজগতকে অনুকরণ করেই সুর সৃষ্টি করেছে। হাতির বৃংহতি, সিংহ ও বাঘের গর্জন, ঘোড়ার হ্রেস্বা, বিড়ালের মিঁঞ মিঁঞ, সাপের ফোঁস ফোঁস, গাভীর হাম্বারব, টিকটিকির টিক্ টিক্ প্রভৃতি সব কিছুই এক একটি নির্দিষ্ট কম্পন তরঙ্গে জীবজন্তুর ভাবের অভিব্যক্তির সুর – যার দ্বারা এই সকল জীবের হাবভাব, চাহিদা এমনকি তাদের মনোভাব আমরা অনেকটা ধরে নিতে পারি। মানুষের সৃষ্ট সুরেও শ্রবণমাত্র সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা বিরহ-মিলন, করুণ ও মধুর প্রকৃতি ভাবের অনুধাবন সম্ভব। সুরের সাথে সংগীতে অথবা সুরান্বিত ভাষা না থাকলেও শুধু সুর মাধ্যমেও তার নিহিত ভাব – আনন্দ বেদনা উল্লাস ও উচ্ছ্বাস – প্রকৃতির বোধগম্য হয়।

ঋতু পরিবর্তনের ছন্দ এবং প্রকৃতির পরিবেশ রূপান্তরের সুর অনুসরণে ভারতীয় রাগমালাকে বিশেষ ঋতুপর্যায়ে ও সময়ের বিভিন্নতায় অনুশীলন ও প্রয়োগ করবার কথা বলা হয়েছে। যেমন ভৈরব রাগ গ্রীষ্মে, মেঘরাগ বর্ষাঋতুতে, পঞ্চম রাগ শরৎ ঋতুতে, নট্টনারায়ণ হেমন্ত ঋতুতে, শ্রী রাগ শীত বা শিশির ঋতুতে এবং বসন্ত রাগ বসন্ত ঋতুতে গীত হয়। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা আবার সন্ধ্যা থেকে প্রভাত এই সময়ের বিভাজনে রাগরাগিনী গুলি নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যেমন ভৈরব রাগ ঊষার আলো আঁধারিতে গাওয়া হয়, রামকিরি গাওয়া

হয় ভোরের আলোকে, বিলাওয়ালী গাওয়া হয় সূর্যোদয়ে, সারেঙ্গীত মধ্যাহ্নে, নট্ট ও মালভ অপরাহ্নে, গৌরী সন্ধ্যায়, কল্যাণ সন্ধ্যার অবসানে, কেদারা পরবর্তী রাত্রে।

আশ্চর্যজনক ভাবে ভারতীয় রাগমালাকে রাজস্থানী শিল্পীগণ মূর্ত করে তুলেছেন তাদের চিত্রে। ঋতুচক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও দিবসের বিভিন্ন লগ্ন ও সময়ে মানব মনের যে ভাব পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ প্রেম, বিরহ, মিলন, দুঃখ, আনন্দ, কান্না, হাসি, মান-অভিমান, উৎকণ্ঠা, অপেক্ষা, উৎসব, ধ্যান সব কিছুই ব্যঞ্জিত হয়েছে চিত্রে। মানব মানবীর বিলাস অভিলাষ সব কিছুই চিত্রিত হয়েছে রাজস্থান ও কাংড়ার শিল্পীদের তুলিকায়। এই রাগরাগিনী চিত্রে বিষয় বিন্যাসে নায়ক ও নায়িকা রূপে কখনও এসেছেন শিব, কখনও রাধাকৃষ্ণ, কখনও রাজা-রাণী বা রাজপুত্র ও রাজকন্যা। রাগরাগিনী চিত্রমালার সর্বত্রই নায়ক-নায়িকা যুবক যুবতী রূপে চিত্রিত হননি। সুরের গভীরতা, বিষয়বস্তু ও আবেগানুসারে নায়ক-নায়িকার বয়স স্থির করা হয়েছে। শিল্পী কৃষ্ণলাল দাস তাঁর 'শিল্প ও শিল্পী' ২য় খন্ডে বলেছেন "চিত্রশিল্পীর ব্যবহার্য ও তাদের সংমিশ্রনে উৎপন্ন শত সহস্র বর্ণের ন্যায় সুর শিল্পীর সপ্তসুর ও তার কোমল খাদ নিখাদ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিভাজিত সুর-চিত্র রাজপুত চিত্রশিল্পী রেখা ও বর্ণের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতের উদারা মুদারা তারা সুরগ্রামের ন্যায় রঙও উজ্জ্বল, মৃদু ও ঘোরতর – এই তিনটি স্থূল বিন্যাসে বিভক্ত।"[৭]

রাগমালা চিত্রে সুরান্বিত বিষয়বস্তু, ভাব ও ঋতুরাবর্তনের সমান্তরালে প্রকৃতির রূপান্তরিত দৃশ্যপটের বর্ণলেপনে বিষয়বিধৃত দৃষ্টিনন্দন বর্ণিকভঙ্গ, রঙের টোন বা লঘু-গুরু-মৃদুর তারতম্য – এসব কিছুর সংহতিতে মুখ্য নির্দেশিকা রূপে অনাবিল ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত বিবিধ সুর ঝংকার, সুরসঙ্গতি তাল ও লয়। শিল্পী কৃষ্ণলাল দাস যথার্থই বলেছেন – "সপ্তসুর বা বর্ণের খেলায় সাধক, সুরকার বা চিত্রকর চিত্তলোকে যে চিত্র সৃষ্টি করেন তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে রূপদান করা অতি সুকঠিন।"[৮] প্রকৃতির সান্নিধ্য আর ধ্যানী মন ব্যতীত চিত্তলোকে ভাব আসে না, এই ভাবের আনয়নে তাই প্রকৃতির অনুরক্ত পাঠক ছিলেন রাজপুত শিল্পীবৃন্দ। অন্যদিক বিচারে রাজপুত ও কাংড়া চিত্রকলাকে মানব মনের প্রকৃতি নির্ভরতার চিত্র বলে উল্লেখ করা যায়। ঋতু পরিবর্তনের সাথে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের ব্যঞ্জনার চিত্র রাজস্থান চিত্রমালা। এখানে চিত্রকরের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক অতি গভীর। ঋতুচক্রের আবর্তনই বিভিন্ন ভাব ও সুরের ছন্দদোলায় শিল্পীকে রঙ ও তুলিকার পথে ক্রিয়াশীল করেছে। ঋতু বিবর্তনের সাথে জীবচিত্তের ভাবান্তর অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দাবদাহে জীবকুল তৃষিত হয়ে ওঠে একফোঁটা বৃষ্টির জলের জন্য। শুধু শিল্পী বা মানুষই নয়; প্রকৃতির লীলায় প্রাণীরাও সাড়া দেয়। বর্ষা দেখে ময়ূরের নৃত্য, ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত লক্ষ্য করে পাখিদের কূলায় গমন, গাভীদের হাম্বারব, কুকুরের পলায়ন কিংবা প্রখর গ্রীষ্মে চাতকের জলকাতরতা, মহিষের নদীবক্ষে অবগাহন; বসন্তে কোকিলের কুহুতান এগুলো তো প্রকৃতির অনুষঙ্গেই ঘটে থাকে, আর মানবচিত্তে প্রকৃতির ভাব তার সুরে, সাহিত্যে, চিত্রে, নৃত্যে, কর্মে পল্লবিত হয়ে ওঠে। শিল্পীরা তাকে চিরস্থায়ী রূপদানে ব্রতী হন।

আকাশের কোনে নবমেঘের আগমনে কবি চিত্ত গেয়ে ওঠে-- "বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে/কোন সে কবির ছন্দ বাজে ঝর ঝর বরিষনে।" পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধার আক্ষেপ মূর্ত হয়ে ওঠে বর্ষাবিরহের এই পদে –

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাড়িয়া।।

কিংবা নাই বা হল বর্ষা, গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, জীবজগতে বৃষ্টির জন্য হাহাকার তখন সাধক শিল্পীর আকুল আবাহনে নেমে আসে তুমুল বৃষ্টির ধারা (মিঞা তানসেনের মেঘমল্লার ও দীপক রাগের কিংবদন্তী আমাদের সকলেরই জানা আছে।) আর এমনি আবেদন রয়ে গেছে রাজস্থানী চিত্রে। গ্রীষ্মে বর্ষার স্বাদ, শীতে বসন্তের আমেজ। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ শিল্পী হৃদয়ে প্রগাঢ় ছাপ রেখে যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্মিত নন্দলালও একটি পত্রে লিখেছিলেন, "কবি (রবীন্দ্রনাথ) দেখেছি প্রখর গ্রীষ্মের দিনেও বর্ষার গান লিখতে পারেন। আমরা পারিনে গ্রীষ্মের দিনে বর্ষার ছবি আঁকতে। বুড়ো বয়সে উনি যেমন প্রেমের কবিতা গান লিখেছেন, কুড়ি বছরের যুবাও তা লিখতে পারে না। চীনারা বলে : যখন চুল পাকবে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাবে, তখন আর্টিস্টের তুলি থেকে ঠিক ঠিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে। কবি সুখের, দুঃখের, প্রেমের তলস্পর্শ করেছেন। এখন, যখন-খুশি, যেমন-খুশি সৌন্দর্য সৃষ্টি করা তারই সাধ্যায়ত্ত। . . ."[৯]

প্রকৃতির চিরন্তন আবেদন শিল্পী হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় ছাপ রেখে যায় তাই গ্রীষ্মের মধ্যে থেকেও বর্ষার আবাহন তারই দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠে। আর রাজস্থানী ও কাংড়ার রূপদক্ষ কলাকুশলী শিল্পীগণ তাদের অমর তুলিকায় সুরের যে তান ও সংলাপ চিত্রবদ্ধ করেছেন তা একই সঙ্গে মেলে ধরলে বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন ঘটে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপমাধুরী ক্রমান্বয়ে একই সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত কলেবরে রাজপুত চিত্রকলার বর্ষাঘন মেঘমেদুর চিত্র কিংবা বসন্তের পুষ্পবিলাস, ফাগের ছোঁয়া আমাদের আনমনা করে দেয়। যেন অশ্রুত রণনে শুনতে পাই মেঘের গর্জন কিংবা শ্রীকৃষ্ণের নুপূরের ঝংকারে যেন এক্ষুণি শুরু হবে বসন্ত রাগ।

৪) জীবজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভিত্তিক শিল্পকলা

ভারতীয় চিত্রকলায় প্রাণীজগতের অবস্থান

পৃথিবীর ইতিহাসে চিত্রসৃষ্টির প্রথম লগ্নে গুহাগাত্রে আদিমানব জীবজন্তুর চিত্রই অঙ্কন করেনি। এই চিত্রগুলির অধিকাংশই শিকারচিত্র। সিংহনপুরের গুহাগাত্রে অঙ্কিত হয়েছে সমবেত শিকারের দৃশ্য, মির্জাপুরে আহত বরাহ, হোসেঙ্গাবাদে সিংহ ও যোদ্ধা, অশ্বারোহী শিকার অভিযান এবং বন্য ঘোটককে বশীভূত করার দৃশ্য। আদিম মানুষ পশুহননের মাধ্যমে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও টিঁকে থাকবার প্রয়াস করেছিল। পন্ডিতেরা বলেন,

আদিমানব খাদ্য ও বাসস্থান অধিকারের জন্য পশুর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল। পৃথিবীতে প্রাকৃত গুহাগুলি ছিল মানবেতর প্রাণী দ্বারা অধিকৃত। খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করতে গিয়ে হিংস্র প্রাণীর কাছে অধিকাংশ মানুষই হত নিহত, কেননা তখন পর্যন্ত প্রাণী হননের কৌশলগুলি ছিল অজ্ঞাত, তাই দৈবের ওপর আস্থাশীল মানুষ দৈবশক্তিকে অনুকূলে এনে প্রাণীবধের পরিকল্পনা নিত। গুহাগাত্রে প্রাণীচিত্র অঙ্কিত করে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে আবার শিকারকার্যে রত হত। স্পেনের 'আলতামিরা' গুহাতেও দুটি বাইসনের চিত্র আছে। একটি জীবন্ত ও দৃপ্ত, অন্যটি নির্জীব ও পদানত। মনে করা হয় এই নির্জীব বাইসনটি মন্ত্রবলে বশীভূত হয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগমনের সাথে ক্রমশ মানুষ কিছু জীবজন্তু হত্যা না করে, পোষ মানিয়ে, নিজ সান্নিধ্যে এনে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের চেষ্টা করে। বুদ্ধিবলে মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকায় প্রাণীকে সঙ্গী করে সভ্যতার উপলপথে যাত্রা করে। ভারতের সভ্যতায় গো-ধন ও মধ্যপ্রাচ্যে উটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত আছি। এবং তখন থেকেই নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী মানুষের সঙ্গী। মানুষ আরও উপলব্ধি করল এই প্রাণীদেরও কতকটা মানুষেরই মত অনুভূতি আছে। আনন্দে, বেদনায়, প্রহারে, ভালোবাসায় তাদের অভিব্যক্তি মানুষেরই মত। আবার কতক স্থলে প্রাণীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি মানুষের চাইতেও তীক্ষ্ম – যেমন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি, অন্ধকারে বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি। হস্তীর শারীরিক ক্ষমতা, পক্ষীর ঊর্ধ্বাচারী ভ্রমণ, বন্য বরাহ ও সিংহের হিংস্রতা মানুষ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল। প্রাণীজগতকে মানুষ তাদের স্বভাব ও প্রয়োজন অনুসারে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলল – গৃহপালিত ও বন্য। গৃহপালিত পশু দিয়েই মানুষ কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সূচনা করে। ক্রমশ রাজশক্তির দম্ভরূপে এই পশুই হল তার বাহন – গজবাহিনী, অশ্ববাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী সৈন্যদল দিকদিগন্তে ছুটে চলল পররাজ্য গ্রাসের সন্ধানে। মানুষের হাতে থেকে বন্য হিংস্র প্রাণীরাও রেহাই পেল না। লক্ষাধিক দর্শকের সামনে সার্কাসের রঙ্গভূমিতে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, জলহস্তী, গন্ডার মানুষের অঙ্গুলি হেলনে নিজেদের প্রদর্শিত করল, চিড়িয়াখানার কথা বাদই দিলাম।

মানুষের সুখ দুঃখ, দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এই প্রাণীজগতের অবস্থান অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়াল। পশুপাখির সঙ্গে মানুষের সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক রচিত হবার ফলে আমাদের সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রে এই প্রাণীজগত এক নব কলেবর লাভ করল। গোযূথ, মৃগশাবক, কলহংস, মিথুন, চক্রবাক সংস্কৃত সাহিত্য রাজ্যে একটি সুন্দর স্থান অধিকার করে আছে। বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'র গল্পগুলিতে পশুপাখি বুদ্ধিতে মানুষেরই সমকক্ষ। প্রাচীন ভাস্কর্যের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত বৃষমূর্তি উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর 'মুসলিম চিত্রকলা' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, "প্রাক-মুসলমান বৌদ্ধস্তুপ বিশেষভাবে সাঁচী এবং অমরাবতীতে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অতি নিপুণতার সহিত খোদাই হইয়াছে। সাঁচীকে বিশেষজ্ঞগণ 'একটি চমৎকার অকৃত্রিম ভারতীয় জঙ্গল বিষয়ক পুস্তক' বলিয়া অভিহিত করেন।"[১০]

ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের এক বিশেষত্ব হল মনুষ্যেতর প্রাণীকে মহত্ত্ব দান। মনে হয় পৃথিবীর আর কোনও দেশে ও সমাজে পশুপাখির এমন উঁচু স্থান প্রাপ্তি ঘটেনি। ভারতীয় সমাজ, জীবনধারা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রে পশুপাখি শুধু মানুষের সমান মর্যাদাই পায়নি, বিশিষ্ট পশুতে দেবত্বও আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত ভারতে জীবজগতের সাথে মানুষের আত্মীয়তা গভীর মর্মবোধে জীবনের ঐকিক চেতনায় বিকশিত হয়েছে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" – ব্রহ্ম সমস্ত কিছুতেই বিরাজমান, এই বিশ্বের যা কিছু বস্তু নিয়ে উদ্ভিদ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, মানুষ সর্বত্রই তিনি সমানভাবে বিরাজমান। বস্তুজগত ও জীবজগত সবই এক ব্রহ্মেরই বহিঃপ্রকাশ। এই সার্বিক ব্রহ্মচেতনায় ভিন্ন ভিন্ন জীব এক অনন্ত ব্রহ্মেরই বিবিধ রূপ ও বহিঃপ্রকাশ। এই দৃষ্টিতে প্রাণী জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক একই প্রাণস্পন্দনের। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতমা।" – এই বিশ্বে যা কিছু অস্তিত্বমান সব প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান (প্রাণেই বিকশিত)। ফলে ভারতীয় উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাভাবনা, প্রাণের এই একত্ববোধ, প্রাণের জন্য প্রাণের করুণা, মমত্ববোধ সহযোগিতা, যোগসূত্র, পারস্পরিক নির্ভরতাকে সাহিত্যে ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় অস্বীকার করতে পারেনি। এই গভীর দর্শন মৌলিকভাবে শিল্পীর আপাতবাহ্য চেতনার অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল। তবে ভারতীয় চিত্রে জীবজন্তুর স্থানপ্রাপ্তি সকল সময় এবং সকল যুগে একই ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। ভারত ইতিহাসের পরবর্তী যুগে বহির্জগতের প্রভাবপুষ্ট যে চিত্রকলা বিকাশলাভ করেছে সেই ক্ষেত্রে পশুপাখির প্রাধান্য বহুলাংশে প্রাণীর আকৃতি বিষয়ে জ্ঞান পিপাসা, সৌখিনতা ও আকর্ষণের বিষয়বস্তু রূপেই হয়েছে। সুদীর্ঘ বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের চিত্রকলায় যে দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়ে পশুপাখির স্থান নির্ণয় হয়েছিল, পরবর্তী সুলতানি ও মুঘল যুগে চিত্রায়নের ক্ষেত্রে পশুপাখির চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সূচিত হয়েছিল।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ধারাকে সচেতন ভাবে মনে রেখেই ভারতশিল্পে পশুপাখির প্রাধান্যের কতকগুলি স্তরবিন্যাস অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর বিভাজন রেখা প্রতীয়মান হয়। এই স্তরগুলি হল –

১) *মানুষের অনুভূতি সাপেক্ষে পশুপাখির অনুভূতির ভাষাকে চিত্রে ও সাহিত্যে স্থান দান ঃ*

যেমন অজন্তার চিত্র ও পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী। পশুপাখি যেন মানুষের ভাষাতেই কথা বলছে, মানুষের মতই আবেগ, অনুভূতি, ক্রিয়াকর্ম, নৈতিকতা, আদর্শ প্রকাশ করছে।

২) *বিবর্তনের ধারা সন্নিবেশে মানুষ জন্মের আগে জীবজন্তুর জীবন ধারণের মাধ্যমে নৈতিক উন্নয়ন ও চেতনার প্রগতি বিকাশ ঃ*

যেমন জাতকের কাহিনী অবলম্বনে অশোকের রাজকীয় ভাস্কর্যে বিভিন্ন পশুর স্থান এবং অজন্তা চিত্রে জাতকের কাহিনীভিত্তিক তথাগতের পশু জীবনের বর্ণনা। পশুকে এখানে নৈতিক জীবন যাপনের মহত্ত্বে স্থাপিত করা হয়েছে।

৩) *পশু ও অন্য সকল জীবে অতিমানবত্ব ও দেবত্ব আরোপ ঃ*

যেমন অবতার রূপে মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে এবং গরুড় ও হনুমানকে দেবত্ব দান।

৪) *পশুপাখিকে দেবদেবী কিংবা দেবতুল্য নারী পুরুষের বাহন রূপে ভাস্কর্যে ও চিত্রে স্থান দান।*

৫) মানব-মানবীর অনুভূতি তথা সুখ, দুঃখ, বিরহ, মিলনের সহমর্মী হিসেবে পশুপাখিকে চিত্রে স্থান দান। কিংবা ঋতু বিশেষকে চিহ্নিত করতে পশুপাখিকে সহায়ক করা। (রাজস্থানী চিত্রে)

৬) *প্রতীক রূপে পশুপাখির চিত্রাঙ্কন,* যেমন – সর্প, মৎস, হস্তী প্রজনন, প্রণয় ও মঙ্গলের প্রতীক। কাক ও প্যাঁচা অনেক সময়েই মৃত্যুর প্রতীক। চিল, বাজপাখি, শকুন, শৃগাল মহামারীর প্রতীক। (যদিও প্রতীকের ধারণাগুলি পরিবেশভেদে পরিবর্তনশীল।

৭) *পশুপাখিকে সাধারণ জ্ঞানের; শৌখিনতা ও আকর্ষণের বিষয় বস্তু রূপে চিত্রে স্থান দান।* যেমন, সুলতানি যুগের চিত্র ও মুঘল যুগের চিত্রে।

অজন্তার চিত্রাবলীতে প্রাণীজগত অপূর্ব দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে। অজন্তায় জাতকের যে ঘটনাগুলি চিত্রিত হয়েছে তাতে দেখি বুদ্ধদেব পূর্ব পূর্ব জন্মে শুধু মনুষ্যদেহেই আবির্ভূত হননি, পশুজীবনেও মহৎ আদর্শের পরিচয় রেখে তবেই বুদ্ধরূপে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। 'ছদন্তজাতক', 'মহাকপিজাতক', 'হস্তীজাতক', 'হংসজাতক', 'সরভমৃগজাতক', 'মচ্ছজাতক', 'মাতৃপোষকজাতক', 'শ্যামাজাতক', 'মহীষজাতক', 'বালহংসজাতক', 'নিগ্রোধমৃগজাতক' প্রভৃতি জাতক কাহিনীগুলি প্রাণীরূপে বুদ্ধদেবের মহত্ব সূচিত করেছে। জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে পশু, অন্য সকল প্রাণী ও মানুষের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস জাতকের কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। অজন্তার শিল্পীগণ অপূর্ব দক্ষতা ও মমতা দিয়ে জাতকের এই কাহিনীগুলিকে চিত্রিত করেছিলেন।

অজন্তায় 'ছদন্তজাতক'এর চিত্রাবলীতে অরণ্যে হস্তীযূথের জীবন, পদ্মসরোবরে জলকেলিরত গজরাজ, হস্তী অনুচর দ্বারা বেষ্টিত ষড়দন্ত গজরাজের চিত্রগুলি সু-অঙ্কিত। হস্তীচিত্র অঙ্কনে ভারতীয় শিল্পীর দক্ষতা পৃথিবীর প্রাণীচিত্র জগতের ইতিহাসে অনন্য। বুদ্ধের 'নলগিরি দমন' এই কাহিনীচিত্রে বুদ্ধ দর্শনে উন্মত্ত হস্তীর স্থির হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি অপরূপ। 'মহাকপিজাতক'এ কপিরাজের দেহসেতুর উপর দিয়ে আশি সহস্র বানরের পলায়ন ও প্রাণরক্ষা, পরিবর্তে কপিরাজের মৃত্যুবরণে সুগভীর কারুণ্য যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি অহিংস কপিরাজের জীবন মহৎ আদর্শের সূচক হয়েছে। 'মৃগজাতক'এর চিত্রে কৃতঘ্ন পথিকের স্বর্ণমৃগরূপ বোধিসত্ত্বকে ধরিয়ে দেওয়া এবং কাশীরাজ সন্নিধানে স্বর্ণমৃগের সদ্ধর্মের বাণী শোনানোর কাহিনী পাই। 'মাতৃপোষকজাতক'এ বোধিসত্ত্ব শ্বেতবর্ণের মহাগজরূপে হিমালয়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেন। গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে উদভ্রান্ত এক কাঠুরিয়াকে পিঠে করে বনপ্রান্তে পৌঁছে দেন অন্ধ পিতামাতার একমাত্র সন্তান মহাগজ। পরিণামে শৃঙ্খলিত হয়ে সে রাজার হাতিশালে স্থান পায়। সাতদিন নিজেকে উপবাসী রেখে, নীরব প্রতিবাদের

মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে মুমূর্ষু অন্ধ পিতাকে সুস্থ করে তোলেন। জাতকের এই কাহিনীগুলিকে চিত্রিত করতে গিয়ে অজন্তার শিল্পীরা প্রাণীদেহ ও জীবনকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যেমন তেমনই প্রাণীহৃদয়ের নৈতিকতার দিকটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

এছাড়াও অজন্তার অন্যান্য চিত্রে ছবির অনিবার্যতায় অজস্র জীবজন্তুর চিত্র এঁকেছেন অজন্তার শিল্পীরা। 'অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি' চিত্রের শূন্যস্থান পূরণে বানর, হংস চিত্রিত হয়েছে। 'শ্যাম জাতক'এ বারাণসীরাজের মৃগয়া শিকারের দৃশ্যে পলায়মান কৃষ্ণসার মৃগের অনবদ্য চিত্রে রেখার ছন্দে অপূর্ব গতি ফুটে উঠেছে। অজন্তার অপর একটি চিত্র 'মরণাহতা জনপদ-কল্যাণী'। কল্যাণীর মূর্চ্ছাতুরা মূর্তির সাথে সঙ্গতি রেখে গৃহচূড়ায় ম্রিয়মান অবনত একটি ময়ূর অঙ্কিত হয়েছে। 'মহাকপিজাতক'এর চিত্রে জলে চলমান মৎসকুল ও হংস চিত্রিত হয়েছে। আর পশুকে নিয়ে অদ্ভুত চিত্র পাই 'সুতসোম জাতক'এ। এমন মর্মভেদী কাহিনী খুব কমই আছে। চিত্রদৃশ্যে বারাণসীরাজ সুদাস অশ্বপৃষ্ঠে, পারিষদ ও দেহরক্ষীবর্গ নিয়ে চলেছেন মৃগয়ায়, সাথে পোষা কুকুর। অরণ্যে পলায়নরত মৃগদল ও বন্যবরাহ। হঠাৎই রাজা দলচ্যুত হয়ে পড়েন, ক্লান্ত রাজা ভূশয্যায় নিদ্রিত হন। ইতিমধ্যে একটি সিংহী ঘুমন্ত রাজার পদলেহন করে এবং রাজার প্রতি অনুরক্তা হয়। রাজা গান্ধর্বমতে সিংহীকে বিবাহ করে রাজপুরীতে নিয়ে আসেন। রাজ্যের মানুষজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সিংহীর গর্ভে সুদাসের পুত্র মনুষ্যদেহী সৌদাসের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর সৌদাস হন কাশীশ্বর, কিন্তু পেলেন না কোনও মানবীর প্রেম, উপরন্তু লক্ষ্য করলেন তাঁকে কেন্দ্র করে প্রজাসাধারণের কৌতুক। একদিন সত্যই নরখাদক হয়ে উঠলেন সৌদাস এবং স্থান হল তাঁর অরণ্যে। সেখানেও নির্বিচারে চলল পথিক হনন। একদিন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা সুতসোম অরণ্যপথে চলছিলেন সন্ন্যাসী নন্দের আশ্রমে। সৌদাস সুতসোমের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। সুতসোম সব ঘটনা শুনে জানালেন – জন্মের জন্য কেউ দায়ি নয়, কর্মেই মানুষের অধিকার। সুতসোমের মুখে বুদ্ধের এই বাণী শুনে সৌদাস সদ্ধর্মের অনুসারী হয় এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রাজর্ষি সুতসোমের।

অজন্তার পরে চালুক্য, ভকটক, পল্লভ, পান্ড্য, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি রাজাদের রাজত্বকালে যে চিত্রের ধারা পাই, তাতে হিন্দু দেবদেবীকে কেন্দ্র করে পশুচিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। হিন্দুপুরাণে অবতারবাদে ভগবান বিষ্ণু দশাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর ভার মোচন করেন। বিষ্ণু প্রথম অবতারে মৎস রূপে অবতীর্ণ হন। কূর্ম রূপে দ্বিতীয়বার ভাসমান পৃথিবীকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু তৃতীয় অবতারে বরাহ রূপে হিরণ্যাক্ষ বধ করেন। চতুর্থ অবতারে বিষ্ণু নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। দেখা যায় চারবারই ভগবান বিষ্ণু পশুরূপ ধারণ করেন।

এছাড়াও হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর প্রত্যেকেরই একটি করে পশু ও পাখি বাহন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। শিবের বৃষ, কৃষ্ণের ধেনু, দুর্গার সিংহ, লক্ষ্মীর প্যাঁচা, সরস্বতীর হংস, কার্তিকেয়র ময়ূর, গণেশের

মূষিক ইত্যাদি। কেন পশুপক্ষী বাহিত এই হিন্দু দেবদেবী? মনে হয় বিভিন্ন পশুর গুণাবলীর সাথে দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য জড়িত আছে। যে শিবকে স্বল্পধ্যানে অনায়াসে লাভ করা যায় তার বাহনও তেমনি আশেপাশে দৃশ্যমান। গোপ জাতির ভূষণ কৃষ্ণের ধেনু আমাদের জীবন জীবিকার সাথে জড়িত, আর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের লীলাখেলার সাথে কৃষ্ণলীলাও তো অনেকটা সম্পৃক্ত। সমস্ত দেবতাদের শক্তি সংহত হয়েছে যে দুর্গায় তাকে অমিতবিক্রমশালী সিংহবাহিনী না হলে কি মানায়? ঐশ্বর্যের অতন্দ্র প্রহরারত প্যাঁচা তেমনি লক্ষ্মীর বাহন। জগতের অবিদ্যা, কুবিদ্যা হতে হংসের মত, হংস যেমন জল মিশ্রিত দুধকে আলাদা করে নেয় তেমনি যথার্থ বিদ্যাকে গ্রহণের জন্য হংসচরিত্র হওয়া আবশ্যক। রূপশ্রেষ্ঠ কার্তিকের বাহন সুদৃশ্য ময়ূর, আর মূষিককে দমনের মধ্য দিয়েই ব্যবসায় সিদ্ধি আসে।

বাহন সম্পর্কে ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, হিন্দু পুরাণকে অবলম্বন করে মন্দির গাত্রে দেবদেবী চিত্রের সাথে পশুবাহনও চিত্রিত হয়েছে। পান্ড্যরাজাদের সময়ে তিরুমল্লাইপুরম গুহায় অলঙ্কৃত পক্ষীচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের ছাদে অঙ্কিত হয়েছে সিংহারূঢ়া এক দেবীমূর্তি। বন্য সিংহটির মুখে ভয়ংকর হিংস্রভাব। ভয়ঙ্কর এই সিংহমূর্তিটি শিল্পীর প্রাণীচিত্র অধ্যয়নের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করছে। এছাড়াও চিত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হংসগুলি তাদের বিশ্রাম, গতি ও নিদ্রা নিয়ে শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিয়েছে। এখানে অপর একটি চিত্রে সরোবরে বহুপ্রকার মৎস্য, পাতিহাঁস, একটি মহিষ, হস্তী পান্ড্যশিল্পীরা দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন।

ইলোরার কৈলাস মন্দিরের চিত্রকর্মেও পত্রপুষ্পের মাঝে পশুপক্ষী বিপুল আলঙ্কারিক কারুকৌশল যুক্ত হয়ে চিত্রে শোভিত হয়েছে। এখানে পদ্মবনে হস্তীযূথের চিত্রখানি নষ্ট হয়ে গেছে। গরুড়ের উপর সমাসীন লক্ষ্মীনারায়ণ চিত্রটি কৈলাস মন্দিরের একটি বিখ্যাত চিত্র। আর রয়েছে ব্যাঘ্রের উপর একটি নন্দন মূর্তি।

জৈন গুহাচিত্রের পশুপক্ষী স্থান পেয়েছে। মহিষারূঢ় সস্ত্রীক এক দেবতার চিত্র এখানে অঙ্কিত আছে। তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে গজপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র ও সাথে অশ্বারোহী অনুচরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অশ্বটির সুঠাম আকৃতি ও গতি আদর্শগতভাবেই চিত্রিত হয়েছে। সিংহবাহিনী চন্ডিকামূর্তিখানি চোল চিত্রযুগের একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র।

বিজয়নগর রাজ্যের মন্দিরগুলির গাত্রেও অজস্র চিত্র রয়েছে। শোভাযাত্রার চিত্রে উট, হস্তী স্থান পেয়েছে। জীবজন্তু স্বল্প হলেও তা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। নায়ক রাজাদের সময়ে কৃষ্ণের বহু চিত্র অঙ্কিত হয়। তন্মধ্যেগোচারণের একটি দৃশ্যে অন্যান্য রাখাল সঙ্গে ধেনু সহ কৃষ্ণ বলরামের চিত্র পাই। তাঞ্জোর মন্দিরের পশ্চিম দিকের প্রাচীরে গজারোহী ইন্দ্র, মেষবাহন অগ্নি, মহিষবাহন যম, মকরবাহন বরুণ, মৃগবাহন পবনদেব চিত্রিত হয়েছেন। এখানে সমুদ্র মন্থনের একখানি চিত্রে মন্থনে উত্থিত ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ও কামধেনু চিত্রিত হয়েছে। রাজস্থানী চিত্রমালাতেও চিত্রের ভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাণীচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই সমস্ত চিত্রমালাতে পক্ষীকুলের সমাবেশই বেশি দৃষ্ট হয়। রাগ ভৈরবে শিব বৃষপৃষ্ঠে অঙ্কিত হয়েছেন।

পঞ্চম রাগের চিত্রখানিতে বিরহী পঞ্চমরাগ তার প্রিয়ার বিচ্ছেদ বেদনা দুই পাশে কৃষ্ণ ও শ্বেত হরিণ দম্পতিকে আদরের ছলে জ্ঞাপন করেছেন। দেশখ রাগ চিত্রে শান্ত সরোবরের মাঝে শ্বেতকায় সারসগুলি মনোরম। দেশখ রাগ তীব্র গতিসম্পন্ন একটি শ্বেতকায় অশ্বপৃষ্ঠে ক্রীড়ারত। 'রাগিনী সীহুতি' দৃশ্যে বিরহী নায়িকার কাছে দুটি ব্যাঘ্রী, তারাও যেন পতিবিরহে কাতরা। নায়িকার মস্তকোপরি পুষ্পিত লতায় এক পক্ষীদম্পতি সীহুতির বেদনাকে আরও গভীর করে তুলেছে। 'ধনশ্রী রাগিনী'তেও অশ্রুসজল বিরহিনী নায়িকা দুটি শশককে আদর করছে। 'রাগিনী আহিরী'তে নায়িকা দুগ্ধপানের জন্য সর্পকে আহ্বান জানাচ্ছেন। 'দীপক রাগ'এর নায়ক গজারোহী, গজের উত্থিত শুন্ডে জ্বলন্ত প্রদীপ। 'রাগিনী কাচ্ছলী' চিত্রে অলসভাবে দুটি মেষের যুদ্ধ লক্ষ্য করছেন। 'রাগিন পটমঞ্জুরী' তে একটি বিড়াল নিয়ে কৌতুক করছেন। 'গুজারী রাগিনী' চিত্রে বীণাবাদনরত নায়িকার সম্মুখে দুটি মৃগদম্পতি, বৃক্ষশাখে পক্ষী। 'কুন্তল রাগ'এ কুন্তল গৃহের ছাদে পায়রা নিয়ে খেলা করছে। 'রাগিনী বিরাটি' ধূসরবর্ণ বৃষের মুখে খাদ্য তুলে দিচ্ছেন। 'রাগিনী সাভেরী' একটি উত্তেজিত আর্তনাদকারী গর্দভের সম্মুখে উপবিষ্টা হয়ে তাকে খাদ্যদানে তৃপ্ত করার চেষ্টা করছেন। 'রাগ গৌড়মল্লার' চিত্রে ঊর্ধ্বাকাশে ঘন বলাকার চক্রাকার সারি দৃষ্ট হয়। 'রাগিনী কুনকুনী' পায়রাকে শস্যবীজ দিচ্ছেন। 'রাগিনী সোহী' একটি খরগোশকে খাবার দিতে ব্যস্ত। 'নট্টনারায়ণ' রাগে বামভাগে গরুড় ও দক্ষিণভাগে বৃষমূর্তি।

রাজস্থানী চিত্রকলার পর মুঘল চিত্রকলায় বিচিত্র প্রাণীচিত্র মুঘল শিল্পীদের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হতে দেখি। পারস্য এবং হিন্দু চিত্রকলার সংমিশ্রনে মুঘল চিত্রকলার নবযুগ সাধিত হয়। মুঘলযুগের শিল্পীরা দু'ভাবে প্রাণীচিত্র অঙ্কন করতেন। প্রথমত চাক্ষুস দেখে, দ্বিতীয়ত অন্যের মুখে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনে। মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তার বিখ্যাত আত্মচরিত 'বাবরনামা'য় জীবজন্তু পশুপাখির প্রতি যে অসাধারণ মমত্ববোধ প্রকাশ করেছেন ও শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত করিয়েছেন, পরবর্তীতে তা প্রপৌত্র জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। জাহাঙ্গীরের শখ ছিল বিরল দর্শন পশুপাখি সংগ্রহ করা ও চিত্রে তাদের অমর করে রাখা। তিনি একদা মুকররব খানকে গোয়াতে পাঠিয়েছিলেন দুর্লভ জীবজন্তু সংগ্রহ করে আনতে। এবং এই সংগৃহীত পশুপাখির মধ্যে একটি তুর্কী মোরগ হচ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবজগতের প্রতি সম্রাটের অত্যধিক মোহ চিত্রকরদের বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি অঙ্কনে উৎসাহিত করে। দারাশিকোর ব্যক্তিগত অ্যালবামেও বহু পশুপাখির চিত্র রক্ষিত আছে, তন্মধ্যে অশ্ব ও একটি বিড়ালের চিত্র উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট আকবর চিত্রশিল্পকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। আকবরের মতে "অনেকেই চিত্রকলাকে ঘৃণা করেন এবং আমি সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করি। আমার মনে হয় যে, সৃষ্টিকর্তাকে জানিবার এক অপূর্ব পদ্ধতি চিত্রকরের জানা আছে। কারণ জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরপর চিত্রায়নে চিত্রশিল্পী

গোঁড়া মুসলমানরা চিত্র পছন্দ করতেন না। তাদের লক্ষ্য করে আকবর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, "আমি লক্ষ্য করি, প্রাণীগণকে লক্ষ্য করা, তাহার সাদৃশ্য আঁকা অনেকের কাছে অলসকর্ম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সুনিয়মিত মনের কাছে ইহা জ্ঞানের উৎস, অজ্ঞানতা বিষের প্রতিষেধক। ধর্মের গোঁড়া অনুসরণকারীরা চিত্রকলার উপর শত্রুভাবাপন্ন। তাহাদের চক্ষু এখন সত্যকে দেখুক।"[১২]

আকবর নিজেও চিত্র আঁকতেন, এ বিষয়ে পারসিক চিত্রকর আবদুস সামাদের নিকট তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। বাজপাখি হাতে যুবরাজ আকবরের একটি চিত্র আছে। সেখানে প্রস্তরখন্ডের উপর বসে দূতের মুখে পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করছেন। আকবরের সময়ে বহু শিকারচিত্র অঙ্কিত হয়। এই বিষয়ের একটি বিখ্যাত চিত্র আছে। চিত্রটিতে হস্তীপৃষ্ঠে সম্রাট আকবর একটি নৌকাযুক্ত করে রাখা সেতুর উপর দিয়ে অন্য একটি উন্মত্ত হস্তীর পশ্চাদ্ধাবন করছেন। শিল্পী বাসওয়ানের তুলিকায় অপূর্ব দক্ষতায় চিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দুটি চলমান হস্তীর ভারে সেতুটির যেন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম, মাঝিরা ছিটকে পড়ে যাচ্ছে, কেউ গলুই ধরে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

'আকবরনামা'য় দুটি শিকারের দৃশ্য আছে। একটিতে বিভিন্ন ধরনের বন্যজন্তু-- হরিণ, চিতাবাঘ, ছাগল, খরগোশ, বনবিড়াল, শৃগাল প্রভৃতিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং আকবর তীর দিয়ে পশুশিকার করছেন। এই চিত্রে পশুদের চাঞ্চল্য, গতিশীলতা এবং উন্মাদনা অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে। অপর একটি চিত্রেও মানুষ ও জীবজন্তুর বিশাল অবস্থান চিত্রিত হয়েছে। এটাও শিকারের দৃশ্য-- ভৃত্যরা লাঠি দিয়ে পশুদের তাড়িত করছে, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বিভিন্ন পশু চিৎকার করছে, ভৃত্যদের কেউ খরগোশ ও হরিণ বধ করে ছাড়াচ্ছে। কোথাও নেকড়ে বাঘ হরিণ শিকার করছে, তাঁবুতে মহিলারা শিকার দৃশ্য উপভোগ করছে, এককথায় দৃশ্যটি জমজমাট। 'আকবরনামা'য় দুটি হস্তীর লড়াইয়ের দৃশ্যও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

মুঘল চিত্রকলার প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে লেখক সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের 'মুসলিম চিত্রকলা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না, "লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড – আফ্রিকান স্টাডিজের গ্রন্থাগারে আকবরের রাজত্বে লিখিত এবং চিত্রিত যে অপ্রকাশিত পান্ডুলিপিটি রহিয়াছে, উহা 'আনওয়ার-ই-সুহাইলী' নামে পরিচিত। বলাই বাহুল্য যে, 'কালিলা-ওয়া-দিমনা'র ফারসী ভাষায় অনুদিত হইলে মুঘল ভারতে ইহা 'আনওয়ার-ই-সুহাইলী' নামে সুপরিচিত ছিল। উইলকিনসন ইহার পঁয়ত্রিশটি মিনিয়েচার মধ্যে একটি, যথা বানর এবং ভাল্লুকদের চিত্র প্রকাশিত করেন। ১৫৭০ খৃস্টাব্দে চিত্রিত এই পান্ডুলিপিখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মুসলিম চিত্রকলার শুরু হইতে পশু-পক্ষীর কাহিনী অবিরাম গতিতে চিত্রিত হইয়াছে। মেসোপটেমিয় চিত্রশালা হইতে হিরাট স্কুল পর্যন্ত এবং পূর্ববর্তী যুগে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে 'কালিলা ও দিমনা'র চিত্রাবলী অঙ্কিত হইয়াছে। জীবজগতের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করিয়া শিল্পী শৈল্পিক চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া প্রতিটি নীতিবাচক গল্পের সুষ্ঠু চিত্রায়ন করেন। উইলকিনসন প্রকাশিত চিত্রটিতে কাশ্মীরের কালো ভাল্লুক বাস্তবধর্মী

রীতিতে অঙ্কিত হইয়াছে। বৃক্ষ এবং আকাশে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রতিফলন হইলেও পাহাড়-পর্বত পারস্য রীতিতে অঙ্কিত; বিষয়বস্তু অর্থাৎ বাঁদর এবং ভাল্লুক সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মুঘল। ঝর্ণাধারাতেও মুঘল বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষণীয়।"

অপরাপর মিনিয়েচারগুলির মধ্যে অন্যতম রাজা ও বিশ্বস্ত ভাল্লুক, উট ও সিংহ, দম্পতি ও চোর প্রভৃতি উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ, সুষ্ঠু চিত্রবিন্যাস, উপাদানগুলির ভারসাম্য, ত্রি-মাত্রিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর বাস্তব চিত্রায়ন এই মিনিয়েচারগুলিকে মর্যাদাদান করিয়াছে। একটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি বানর ও ছয়টি কাশ্মীরি ভল্লুককে অতি চাতুর্যের সঙ্গে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই চিত্রে পারস্য ও ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রন দেখা যায়, এমনকি পাশ্চাত্য পটপ্রেক্ষিতের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।"[১৩]

আবুল ফজল বলেন, "আকবরের রাজত্বে প্রতিকৃতি চিত্রকর দাসাওয়ান্ত ও প্রাণীর চিত্রকর জগন্নাথ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।" আকবরের রাজত্বকালে মিনিয়েচারে জীবজন্তুর অপূর্ব চিত্রায়ন চোখে পড়ে। গোবর্ধনের অঙ্কিত আকবরের প্রতিকৃতির সম্মুখে দুপাশে একটি সিংহ ও বকনা বাছুর দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। স্মিথ জগন্নাথের অঙ্কিত একটি ময়ূরের সাপ ভক্ষণরত চিত্র প্রকাশ করেন।

জাহাঙ্গীরের সময়ে পশুচিত্রে বাস্তবতার আদর্শ দেখা যায়। জাহাঙ্গীর শুধু চিত্রেই অনুরাগী ছিলেন না, পশুপাখি সংগ্রহ করে এক বিশাল চিড়িয়াখানা গড়ে তুলেছিলেন। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তর 'শিল্পে ভারত ও বর্হিভারত'এ পাই "জাহাঙ্গীরের একটি পশুশালা ছিল, সেখানে অন্যান্য পশুর মধ্যে ন্যূনাধিক একশত সিংহ ছিল; পনেরোটি ছিল অল্পবয়স্ক, তাহারা ছিল পোষা, পোশাক পরিয়া রাজপ্রাসাদে নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইত, মানুষের কোনও ক্ষতিসাধন করিত না। পক্ষীশালায় ছিল চারিহাজার সঙ্গীতকারী পাখী। জাহাঙ্গীর আত্মজীবনীতে পশুপক্ষী সম্বন্ধে তাঁহার ঔৎসুক্য এবং তাহাদের চিত্রাঙ্কনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 'যে সকল জীবজন্তু আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকিয়াছে, তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি, এবং অঙ্কন করিতে আদেশ দিয়াছি, অবশেষে ইহার সমাদর বাড়াইয়াছি।"[১৪]

জাহাঙ্গীরের মৃগয়ার একটি দৃশ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই চিত্রে হস্তীপৃষ্ঠে জাহাঙ্গীর একটি সিংহকে মারতে উদ্যত হচ্ছেন এবং সিংহটি হস্তীটিকে আক্রমণ করছে। এই শিকার সম্পর্কে জাহাঙ্গীর তার আত্মচরিতে বর্ণনা করেছেন -- "শাহজাদা থাকাকালীন ও আজ পর্যন্ত আমি যতগুলি সিংহ বধ করিয়াছি উহাদের মধ্যে ইহার মত বৃহদাকার এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ পশু আমি পূর্বে দেখি নাই। আমি সিংহের হুবহু প্রতিকৃতি গ্রহণের জন্য চিত্রকরকে আদেশ করিয়াছিলাম।"[১৫]

ব্রাউন বলেন, "জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলায় পশু-পক্ষীর প্রতিকৃতি অঙ্কন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।"[১৬] প্রাণীদের বাস্তবধর্মী চিত্র অঙ্কনে বিহজাদ্, মনসুর প্রভৃতি শিল্পীগণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। "অনেকের মতে, পশুপক্ষীর প্রতিকৃতি অজন্তা গুহাচিত্রের রীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিন্দু চিত্রকরদের দ্বারা

সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। কিন্তু ওস্তাদ মনসুর, ওস্তাদ হুসাইন এবং আব্দুল হুসাইন প্রভৃতি মুসলিম শিল্পীগণ জীবজগতের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করিয়া অসংখ্য চিত্র অঙ্কন করেন।"[১৭]

জাহাঙ্গীরের নির্দেশে অঙ্কিত পশুপাখির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল –

১) বাজপাখি (শিল্পী : ওস্তাদ মনসুর)

২) তুর্কী মোরগ (ঐ)

৩) শৃঙ্খলবদ্ধ মেষ (ঐ)

৪) একটি সুন্দর পাখি - *চিয়ার ফেজেন্ট* (ঐ)

৫) সাদা বক (ঐ)

৬) জেব্রা (ঐ)

৭) মোরগ (ঐ)

৮) নীল গলা বিশিষ্ট হিমালয়ের পক্ষী - বারবেট (ঐ)

৯) লাল ঝুঁটি বিশিষ্ট জলচর পাখি - লাপ উইঙ্গ (ঐ)

১০) ভারতীয় হরিণ এবং তিব্বতীয় ছাগলজাতীয় পশু (ঐ)

১১) নীল গাই (ঐ), এছাড়া

১২) কালো তিতির পাখি এবং লিলি

১৩) পুরুষ ও মেয়ে সোনালি পাখি

১৪) কলহরত হরিণদ্বয় ও পশুশাবক

১৫) দুটি কিচির মিচির পাখি

১৬) বাজপাখি

১৭) চিতাবাঘ ও হরিণ

১৮) শকুন ও পাখি (এগুলি সব বার্লিন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে)

১৯) ময়না

২০) চারটি অদ্ভুত ধরনের পাখি

২১) বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত পাখিসমূহ

২২) আনওয়ার-ই সুহাইলি অর্থাৎ পাখিদের দলে কাক

(জাহাঙ্গীরের পক্ষীশালার সমস্ত পাখি-ই এখানে চিত্রিত হয়েছে। যেমন, বক, ময়ূর, তিতির, চড়ুই, হাঁস, টিয়া, দোয়েল, কোয়েল, ময়না, সারস, প্যাঁচা, কাক -- দশজন হিন্দু ও ছয়জন মুসলিম চিত্রশিল্পী মিলে এই চিত্র অঙ্কন করেন।)

২৩) পেঁচা ও পাখির দল

২৪) ষাঁড় চালিত শকট

২৫) উটজাতীয় পাখি

২৬) কালো মৃগ এবং মৃগী

২৭) দুটি কলহরত উষ্ট্র

২৮) হিমালয়ের বন্য ছাগল

২৯) ছাগল ও ছাগীদের প্রতিকৃতি

৩০) উন্মত্ত হস্তী

এছাড়া দারাশিকোর অ্যালবামে দারাশিকোর পছন্দের ঘোড়া 'দিলপসন্দ', বিড়াল, একজোড়া হাঁস উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থ নির্দেশিকা ঃ

১। কৃষ্ণলাল দাস : শিল্প ও শিল্পী, ২য় খন্ড (প্রাচ্য শিল্পকথা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-১৯৮২, পৃঃ- ২০৯-২১১

২। ঐ, পৃঃ - ২১০

৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৪১

৪। ঐ, পৃঃ ৪২

৫। ঐ, পৃঃ ৩৯

৬। কৃষ্ণলাল দাস : শিল্প ও শিল্পী (শিল্প শিক্ষা পদ্ধতি), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-১৯৭৭, পৃঃ- ৫১

৭। কৃষ্ণলাল দাস : শিল্প ও শিল্পী, ২য় খন্ড (প্রাচ্য শিল্পকথা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-১৯৮২, পৃঃ- ২৭৮

৮। ঐ, পৃঃ - ২৭৮

৯। নন্দলাল বসু : দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ - ২৯২

১০। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : মুসলিম চিত্রকলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৭৭

১১। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত : শিল্পে ভারত ও বর্হিভারত, বিশ্বভারতী, ১৯৭৫, পৃঃ ১২০

১২। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : মুসলিম চিত্রকলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৯৮

১৩। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত : শিল্পে ভারত ও বর্হিভারত, বিশ্বভারতী, ১৯৭৫, পৃঃ ১৪০

১৪। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : মুসলিম চিত্রকলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৪৩৪

১৫। ঐ, পৃঃ ৪৭৩

১৬। ঐ, পৃঃ, ৪৭৬

১৭। ঐ, পৃঃ, ৪৮১

ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশ ও বিবর্তন

ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস এদেশের সার্বিক ইতিহাসের মতোই নীরব এবং তার ধারাবাহিক বিবর্তন বহুলাংশে অজ্ঞাত। প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাস লিখতে জানতেন না, কিংবা ইতিহাস চর্চাকে অবজ্ঞা করেছেন, এ কথা আংশিক সত্য। প্রকৃত সত্য হল পাশ্চাত্যের প্রভাব পূর্ণরূপে অনুভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্তই ভারতীয়রা ইতিহাস লেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। শত উত্থান-পতন, বিদেশি আক্রমণ, বহির্ভারত থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তক্ষয়, সংঘাত ও মিলন এতসব অসংখ্য বিষয় ভারতীয় মণীষীদের চিন্তায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেনি; এবং এ সকল বিষয়কে স্থান ও গুরুত্ব দিয়ে কোনও বর্ণনা মূলক রচনার আগ্রহ তাদের মধ্যে ছিল না বলা যায়। বেদ, মহাকাব্য ও পুরাণ নিয়ে উত্তরোত্তর চর্চার পুনরাবৃত্তি হলেও, ইতিহাস চেতনার প্রতি এই আড়ষ্টতা বিস্ময়কর। ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস ব্যতীত অতীত ভারতের চারুকলার অনবদ্য ইতিহাস জানা সম্ভব নয়; বাস্তবিক আজ পর্যন্ত সে ইতিহাস রচনা হয়নি।

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার এখনও অসম্ভব বলে সিন্ধু সভ্যতায় কোন শিল্পীরা বিভিন্ন পাত্রের গায়ে সুন্দর চিত্রাঙ্কন করেছেন, মূর্তি তৈরি করেছেন তা জানা যায়নি, তেমনি ইতিহাস বিবর্জিত হওয়ার ফলে বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগে চিত্রচর্চা কী পর্যায়ে ছিল, চিত্র বিষয়ে শাসককুল ও প্রজাসাধারণের আগ্রহ কেমন ছিল, শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা কীরূপ ছিল, এবং সে যুগে শ্রেষ্ঠ শিল্পী কারা ছিলেন – কিছুই জানা যায় না। অথচ প্রাচীন গ্রিস, চীন ও রোমের শুধু বরেণ্য শিল্পীদের নামই আমরা জানি না, তাঁদের শিল্পকর্ম, শিল্পবস্তু ও উৎকর্ষতা বিষয়েও বহু তথ্য ও কাহিনী সে সকল দেশের সমাজে ঐতিহ্যের গরিমা বহন করে চলেছে এবং তা নিরবচ্ছিন্নভাবে যুগ যুগ ধরে।

জানি না নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পাঠাগারে তেমন কোনও ইতিহাসের পুঁথি ছিল কিনা যা ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন কল্পনায় বাধা দেবার কেউ না থাকলেও যুক্তির উত্তরণ সম্ভব হয় না। যদি তেমন কোনও ইতিহাস থাকতো তবে তার কোনও না কোনও অংশ যে কোনও পথেই হোক না কেন মানুষের স্মৃতির জগতে থেকে যেত, কিংবা তিব্বত ও চীনেও তার কিয়দংশ রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যেত। সেরকম কিছু ইতিহাসের অবলুপ্ত পাতা হিমালয়ের উত্তর থেকে এদেশে পরবর্তী কালে বেরিয়ে আসেনি। এতে বোধগম্য হয় যে ভারতের ইতিহাস আধুনিক ইউরোপীয় প্রভাবে যেটুকু লিখিত হয়েছে তার অতিরিক্ত পাওয়ার সম্ভাবনা বিরল। অথচ প্রাচীন ভারতে উঁচুমাপের চিত্র তৈরি হয়েছে যা তুলনায় পৃথিবীর যে কোনও দেশের চিত্রধারার সমকক্ষ। কিন্তু তার ইতিহাস লিখিত হল না কেন? এর উত্তর খুঁজতে হবে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা এবং শিক্ষার পরিবেশের মধ্যেই। অস্বীকারের উপায় নেই, বর্ণপ্রথার ফলে প্রাচীন ভারতে ধর্মগ্রন্থ রচনা ও সাহিত্য সাধনা

হয়েছে নির্দিষ্ট স্তরের মানুষের দ্বারা এবং তারা নিজেদের কথা ছাড়া সাধারণ মানুষের কীর্তিকাহিনীকে গুরুত্ব দেননি। আমরা লেখক মুনি ঋষিদের নাম জানি। ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নিয়মকানুন নিয়ে যারা লিখে গেছেন তাদের নাম সোনার অক্ষরে লিখিত আছে। শুধু বাল্মীকি বা ব্যাস নয়, যাজ্ঞ্যবল্ক, মনু থেকে ভবদেব ভট্ট সকলেরই নাম আমরা জানি। শুধু জানি না যারা শিল্প জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনে হয় সমাজের উঁচুতলার মানুষ এ সকল কাজে মনোনিবেশ করেননি, তাই যে স্তরের মানুষ শিল্পচর্চা করেছেন তাদের নাম বিভিন্ন লেখায় ইচ্ছাকৃতভাবেই অবহেলিত হয়েছে। শুধু পাল যুগের বীটপাল ও ধীমান ছাড়া অন্য কারও নাম আমাদের সর্বজনের জ্ঞাতব্য বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি; এবং এই নামগুলিও তিব্বত এবং নেপালে প্রাপ্ত ইতিহাসের উৎস থেকেই বিশেষভাবে জানা যায়। অজন্তা ইলোরা ও বাগের শিল্পীগণ হয়তো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন; এবং আত্মনিবেদিত এই সন্ন্যাসীরা আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন বলেই ধর্মনিষ্ঠার পরিপন্থী বিবেচনা করেই খুব সম্ভবত নিজেদের নামোল্লেখ করে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যেতে প্রলুব্ধ হননি। তবে জানি না গান্ধার মথুরা ও সারনাথের অসংখ্য ভাস্করের নাম কী কারণে কোনও সাহিত্যে পর্যন্ত উল্লিখিত হল না। হয়তো সেই সকল শিল্পীও নিজেদের জীবিকার জন্যই শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং সামাজিক অবহেলার পরিণামে তারাও বিস্মৃত হয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে আধুনিক ভারতে শিক্ষিত চিত্রশিল্পীদের যে সামাজিক মর্যাদা আছে তার কিয়দংশও স্বীকৃত ছিল না প্রাচীন ভারতে। অবশ্য মুঘল যুগের শিল্পীদের নাম ধরে রেখেছেন মধ্যযুগের বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি লেখক যারা মুঘল দরবারে মর্যাদা পেয়েছিলেন।

ভারতে মার্গচিত্রের ইতিহাস যেমন অজানা, তেমনি লোকচিত্রের ইতিহাসেরও কোনও হদিশ মেলেনি। হয়তো সাধারণ অস্থায়ী পটে চিত্রাঙ্কনের ফলে লোকায়ত চিত্রের ঐতিহ্যই শুধু টিঁকে ছিল কিন্তু তার ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষিত বা লিখিত হয়নি। এদেশের আর্দ্র জলবায়ু, আবহাওয়াও এর জন্য বিশেষভাবে দায়ি। তাছাড়া লোকায়ত বা সমাজায়ত শিল্প ও চিত্রকে সংরক্ষণের কোনও নির্ভরযোগ্য উপায় ও প্রচেষ্টা ছিল না। ধর্মীয় পূজাপার্বণ ও অনুষ্ঠানের জন্যই সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে ও আগ্রহে চিত্রের চর্চা টিঁকে থাকলেও সংরক্ষণের অভাবে চিত্রবস্তু হারিয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে। এর ফলে সৃষ্ট হয়েছে এক ঐতিহাসিক শূন্যতার এবং তৈরি হয়েছে ভারতীয় চিত্রের নির্ভরশীল ধারাবাহিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যার অভাব। সেই অভাব ও শূন্যতাকে স্বীকার করে নিয়েই অদ্যাবধি প্রাপ্ত চিত্রবস্তুকে কেন্দ্র করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ভারতীয় সভ্যতায় চিত্রের মান, গুরুত্ব, চিত্রবিষয় ও তার সন্ধান এবং সর্বোপরি ভারতীয়দের সুন্দরের ধ্যানকে উপলব্ধির জন্য।

ইতিহাস বিবর্জিত ভারতে চিত্র বিকাশের বিভিন্ন গতি ও ধারার প্রবাহকে বর্তমান থেকে অতীতের দিকে তাকিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করলে কিংবা যে সকল চিত্রবস্তু পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে যাদের অস্তিত্ব আছে তাদের বিচার বিশ্লেষণ করলে, অথবা অদ্যাবধি বাংলায় চিত্রকলাকেন্দ্রিক যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার

সুগভীর বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি পর্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই পর্যায়গুলি অবলম্বনে ভারতীয় চিত্রের মূল গতির বৈচিত্র্যকে নিম্নে সংক্ষেপে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এই পর্যায়গুলি নিম্নরূপ ঃ

ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশ

১) গুহার গায়ে ছবির বহর ঃ প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র

২) মাটির নীচে রূপের ঝলক ঃ সিন্ধু সভ্যতার যুগের চিত্রকলা

৩) ফিরে পাওয়া রূপের পুরী ঃ অজন্তা, ইলোরা ও বাগ

৪) পুঁথির বিষয় চিত্রালোকে ঃ পাল ও সেন যুগে গুজরাটি পুঁথিচিত্র ও জৈন পুঁথিচিত্র

৫) ঋতুরাগের রূপরাজত্ব ঃ রাজপুত চিত্রকলা

৬) দরবারি সব চিত্রসম্ভার ঃ মুঘল চিত্রকলা

৭) সাধারণের অতীতধারা ঃ লোকায়ত চিত্রকলা

৮) সাগর পারের আলোর প্রভাব ঃ পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রভাব

৯) অতীত রূপের গভীর টানে ঃ বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট

১০) সমন্বয়ের নতুন পথে ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রধারার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়

গুহার গায়ে ছবির বহর ঃ প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র

ভারতে আদিম মানবগোষ্ঠীর লিখিত ইতিহাস না থাকলেও অলিখিত ইতিহাসের সন্ধানে অজানিত ইতিহাস উন্মোচিত হয়েছে। প্রাচীনের প্রত্ননিদর্শনের সাক্ষী প্রাচীন ও নতুন প্রস্তর যুগের ব্যবহৃত জন্তুজানোয়ারের অস্থিনির্মিত এবং বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার পাওয়া গেছে এদেশের বিভিন্ন স্থানে। পরবর্তী তাম্রযুগ ও লৌহযুগের আবির্ভাব মানুষ আদিমতা কাটিয়ে মৃত্তিকা নির্মিত হাঁড়ি কলসীর সুন্দর গঠন দিতে শিখেছিল এবং সেই সকল নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলির গায়ে তদানীন্তন ভাবনা অনুযায়ী লতাপাতা ও জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কন করেছিল। কালের কবলে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত যে ভগ্নাবশেষ ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে তা থেকে প্রাচীন মানুষের সৌন্দর্য স্পৃহা ভাবের ভাষা, জীবিকাভিত্তিক চেতনা এবং তাদের জ্ঞানকে চিরস্থায়ী করে রাখার যে চারুবৃত্তির সূচনা ঘটেছিল তার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের গায়ে নয়, আদিম মানুষের চারুচেতনার সক্রিয় প্রমাণ মিলেছে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল তার প্রমাণ ও নিদর্শন আধুনিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়রূপে উঠে এসেছে। বাংলার চিত্রালোচকগণ নাতিদীর্ঘ পরিসরে হলেও সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

অশোক মিত্র তাঁর 'ভারতের চিত্রকলা' প্রথম খণ্ডে, শ্রী কৃষ্ণলাল দাস 'শিল্প ও শিল্পী' দ্বিতীয় খণ্ডে এবং বিমল দেব 'চিত্রকলায় পূর্ব পশ্চিম' গ্রন্থে ভারতের সুপ্রাচীন গুহাচিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। অশোক মিত্র বিভিন্ন গুহার চিত্রসমুদয়ের উল্লেখ করে চিত্রগুলির কালনির্ণয় অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন। ভারতের বিভিন্ন গুহাতেও পৃথিবীর অন্যসকল দেশের প্রাচীন গুহাগুলির মতোই বিভিন্ন জীবজন্তু ও শিকারের দৃশ্যে পূর্ণ। প্রাচীনতম গুহাচিত্র সম্পর্কে অশোক মিত্র লিখেছেন – "ভারতের ঠিক মাঝখানে কাইমুর রেঞ্জ বলে এক পাহাড়ের মালা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি গুহায় শিকারের ছবি কিছু কিছু এখনও অস্পষ্ট দেখা যায়। এগুলি গুহাচিত্র হিসেবে খুব ভাল বলা যায় না কিন্তু বোধ হয় পাথর যুগেরও আগেকার ছবি।" তিনি আরও লিখেছেন – "মির্জাপুরের কাছে বিন্ধ্যপর্বতমালার মধ্যে কিছু গুহা আছে তাতে পাথর যুগের শেষের দিককার সময়ের কিছু কিছু ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই গুহাগুলি কিছু বছর আগে খুঁড়ে আবিষ্কার করা হয়েছে।"[১] এই সকল গুহাচিত্র অঙ্কনে প্রাচীন মানুষ পাথর ঘষে রঙ তৈরি করেছিল। বিভিন্ন ধরনের মিশ্র রঙের পাথর ঘষে বিবিধ রঙ তৈরি করে কখনও স্বাধীনভাবে, আবার প্রয়োজনে মিশ্রণ ঘটিয়ে রঙের ভিন্নতা আনয়ন করা হত। উড়িষ্যার সম্বলপুরের উত্তরে একটি পাহাড়ে কয়েকটি গুহায় এবং উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় কয়েকটি গুহাভ্যন্তরে পশু শিকারের ছবি পাওয়া গেছে। গণ্ডার এবং শিংওয়ালা হরিণের ছবিই বেশি।

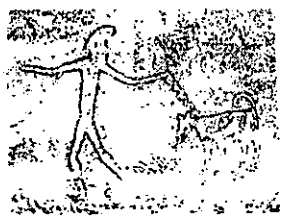

তবে ভারতের প্রাচীন গুহাচিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চিত্র পাওয়া গেছে ভীমভেটকার গুহাগুলিতে। ভীমভেটকার ছবি "ইতিহাসের আগের যুগের, কারণ যে রঙ এতে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি মাটি বা পাথরের আকর গুঁড়ো করে তৈরি হয়েছিল। তদুপরি রঙ বাছাই ও প্রয়োগের রীতি-প্রকৃতি, রেখার বলিষ্ঠতা, চিত্রগুলিতে প্রাণী ও ঘটনার আকৃতি, গতি ও বেগের দ্যোতনা, দর্শকের মনকে ইতিহাসের আগের যুগেই নিয়ে যায়।"[২]

"সম্প্রতি ১৯৮৮ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ রাজস্থানের জয়পুর জেলার বিরাটনগরের কাছে আরাবল্লী পাহাড়ের কিছু গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এগুলি প্যালিও-লিথিক যুগেরও হতে পারে। গুহাচিত্রগুলি পাওয়া যায় ত্রিশটি গুহাশ্রয়ে . . . ছবিগুলি মুখ্যত জীবজন্তুর : হরিণ, মহিষ বা বাইসন, ভাল্লুক, বাঘ, হাতি এমনকি মাছ। তার সঙ্গে অবশ্য আছে মানুষের ছবি এবং অনেক জ্যামিতিক আলপনা বা ছক। ছবিগুলি আকার আঁকা হয়েছে লাল সিঁদুর মাটিতে, কিছু কিছু ছবির জমি সাদা রঙে লেপা। মহিষ, বাইসন ও বাঘ লাল সিঁদুর মাটিতে আঁকা। মহিষগুলির সম্মুখ অর্থাৎ মাথার দিকটা লাল সিঁদুর মাটিতে আঁকা, পিছনদিকগুলি কালো কালো ডোরাকাটা। তার মধ্যে একটি ছবি আছে সম্মুখে আগুন, তার দিকে মুখ করে থমকে দাঁড়ানো এক হরিণ, আগুনের পাশে একটি বর্শা ও ঢাল।"[৩]

মাটির নীচে রূপের ঝলক ঃ সিন্ধু সভ্যতার যুগের চিত্রকলা

প্রস্তর যুগ ছাড়িয়ে তাম্রপ্রস্তর যুগ। সময়ের গতিপথে পেরিয়ে গেছে হাজার হাজার বছর, বিবর্তিত হয়েছে সভ্যতা। আর ভারতের ইতিহাসে এই সময়েই আবির্ভূত হয়েছে অতি উঁচু মাপের নাগরিক সভ্যতা যার তুলনা সারা বিশ্বে বিরল। খনন কার্যের ফলে বেরিয়ে এসেছে কয়েক সহস্র বছরের নাগরিক জীবনের নিদর্শন এবং তার সঙ্গে চিত্রকলার জগতে সে যুগের মানুষের অত্যুৎকৃষ্ট সৃজনশীলতার অপূর্ব নিদর্শন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর খনন শুরু হয়েছিল সিন্ধু অববাহিকায়, উঠে এসেছিল ভারতের ইতিহাসকে আরও কয়েক সহস্র বছর আগের বলে প্রমাণ করার প্রত্ননিদর্শন। কিন্তু সময়ান্তরে আফগানিস্তানের সীমান্ত থেকে সিন্ধুর মোহনা, গুজরাট ও কাম্বে উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল এবং সেখান থেকে সমুদ্রতীর ধরে আরও দক্ষিণে কিংবা উত্তরে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন নদীতীর ধরেই পাওয়া গেছে অনুরূপ নাগরিক সভ্যতার নিদর্শন। লোথাল, আমরি, কোয়েটা, কালিবঙ্গাল, ধোলাবীর প্রভৃতি সহ প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীর ধরেই মিলেছে নগরের ধ্বংসাবশেষ। সুপরিকল্পিত নগরগুলির রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, স্নানাগার, শস্যাগার, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তায় রেড়ির তেলের বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই শুধু আমাদের ভাবিত করে না, আশ্চর্য হতে হয় নগরবাসীদের শিল্পচেতনা এবং চারুকলার জগতে সৃজনশীল একনিষ্ঠ মনোভাব দেখেও। সব দেখে মনে হয় ভারত ইতিহাসের কাল নির্ণয় নতুন করে করতে হবে। হয়তো খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ থেকে ৪০০০ বছরের মধ্যে ভারতে কয়েকটি নগরকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটেছিল এবং জলপথ ছিল সাম্রাজ্যগুলির যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মতো নাগরিক সভ্যতায় প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব না হওয়াতে তাদের প্রকৃত ইতিহাস ঐতিহাসিকের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল। প্রত্নসামগ্রী থেকে পূর্ণকল্পিত ইতিহাস লিখিত হলেও তা প্রকৃত ইতিহাস বা সত্যের কাছাকাছি নয়। হরপ্পার যুগের নগরগুলিতে দেওয়ালচিত্র ও কোনও ক্যানভাসে চিত্র পাওয়া যায়নি। মন্দির বা দেবালয় বলেও কোনও প্রাসাদ চিহ্নিত হয়নি। তবে দেবমূর্তি পাওয়া গেছে খননের বিভিন্ন স্তরে। বিভিন্ন ধরনের রঙিন মৃৎপাত্রের গায়ে অসংখ্য ছবি আঁকা হয়েছিল সে যুগের নাগরিক সভ্যতায়।

অশোক মিত্র কোয়েটা, আম্‌রি, নাল ও না-দারা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের গায়ে অঙ্কিত ছবি নিয়ে লিখেছেন, "এখানকার (কোয়েটার) মাটির পাত্রগুলির জমি রাফ বা হলদেটে রঙের, বেগনি আভাওলা লালচে খয়েরি (কালো) রঙের কালি দিয়ে দরাজ ভাবে, নিশ্চিত নিপুণ হাতে আঁকা। দ্বিতীয় কোনও লাল রঙ নেই। পাত্রগুলির গড়ন বেশ ভাল, একটু পলতোলা মত। কোন কোন পাত্র বেশি পোড়ানর দরুণ গোলাপী সাদা এমনকি ঈষৎ সব্‌জে দেখায়, কোন কোনটা আবার ছাই রঙের বেশ শক্ত খোলা, তাতে 'কালো' রঙে নকশা আঁকা। নকশাগুলি সবই জ্যামিতিক রেখা, কোন জীবজন্তুর ছবি নেই। মোটা সরু রেখা দিয়ে তীরের ফলার

আকারের আঁকা, চতুষ্কোণকে আড়আড়ি ভাগ করে ভাঙা, উল্টোদিকে মুখ ঘোরানো ত্রিভুজ অথবা ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত করে আঁকা।"[৪]

"আমরি, নান্দারা বা নাল সবেতেই চিত্রগুলির রেখা প্রথমে কড়া তুলি দিয়ে 'কালো' বা ব্রাউন রঙে আঁকা হত। আমরি আর নান্দারায় লাল দ্বিতীয় রঙ হিসেবে ব্যবহার হত। কিন্তু নালে লাল ত থাকতই, উপরন্তু হলদে, নীল, সবুজ রঙ দেওয়া হত, তাতে নানা রঙের চিত্ররীতি গড়ে ওঠে। মাটির পাত্রে নীল আর হলদের ব্যবহার পশ্চিম এশিয়ায় ইতিহাসের যুগের আগে একমাত্র নালেই দেখা যায়। . . . নান্দারার পাত্রে বেশ ভাল আঁকা জীবজন্তু খুব পাওয়া যায়, যেমন সিংহ, মাছ, পাখি, তাদের গায়ের সবটা লাল রঙে ভর্তি। একটি মাত্র বলদ পাওয়া গেছে। হরতনের নকশা প্রায়ই পাওয়া যায়, এটি পিপুল গাছের পাতা থেকে নেওয়া। পিপুল গাছ এখনকার মত তখনও বোধহয় লোকে পূজা করত। মাঝে মাঝে কালো হরিণ বা আইবেক্স, স্টাইলাইজড ভাবে আঁকা পাওয়া যায়।"[৫]

কোয়েটা, আমরি, নান্দারা প্রভৃতি প্রাচীন নগরীতে যে স্তরের চিত্রকর্ম পাওয়া গেছে গুণ ও মানের দিক থেকে তার চেয়ে বেশি উঁচু মাপের ছিল হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পার যুগের সভ্যতার চিত্রগুলির মান। হরপ্পা সংস্কৃতির মৃৎপাত্রের ছবি সম্পর্কে অশোক মিত্র লিখেছেন, "ছবিগুলি লাল জমির উপরে কালো রঙে আঁকা, আলপনা বা ছবিগুলি গাঢ় লাল, জ্বলজ্বলে পালিশ করা গায়ের উপর চিত্রিত। দুই ধরনের চিত্র বা প্যাটার্ন ঘুরে ফিরে আসে : একটি জ্যামিতিক বা অপ্রাকৃত, তার মধ্যে গোল বা বৃত্ত পরস্পরের উপর পড়ে জাফ্রির মত প্যাটার্ন তৈরি করেছে। দ্বিতীয় প্যাটার্নটি হচ্ছে প্রকৃতি থেকে নেওয়া গাছপালা, জন্তুজানোয়ারের ছবি। প্রথম প্যাটার্নটি অত উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি হরপ্পার নিজস্ব। . . . কোন বিশেষ ছন্দ বা সমতা না রেখে রাশি রাশি লতাপাতা, লতার ডগা চলে গেছে, তার মাঝে মাঝে পাখি (কখনও ময়ূর), আবার কখনও কখনও অন্য চতুষ্পদ জন্তু।"[৬] কিন্তু হরপ্পার অদ্বিতীয় ছবি পটারির গায়ে মানুষের ছবি। "একটি পাত্রে একটি মানুষ কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে যাচ্ছে, দুদিকে দুটি বড় বড় মাছধরা জাল, পিছনে বোধহয় একটি বড় কাছিম, তার পিছনে মাছ, পা দুটি একটি মোটা রেখার পটির উপর দাঁড়িয়ে, তার তলায় আড়াবোনা রেখা চলে গেছে নীচের দিকে, একটি বোধহয় নদী, তার পাশ দিয়ে লোকটি হেঁটে চলে যাচ্ছে, অন্তত সেই রকম মনে হয়। যেন কোন আধুনিক ছবি, রেখার স্বল্পতা আর পারিপাট্যের উপর এত নজর। আর একটি টুকরো পাওয়া গেছে, (এটি বোধহয় অনেক পরের) সেটি দেখে মনে হয় খুব বিশদভাবে আঁকা ছিল, পাত্রটির গা জুড়ে ফলাও করে অনেকগুলি প্যানেল ছিল মনে হয়। একটি প্যানেলে প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার পরের প্যানেলে চৌকো চৌকো সতরঞ্চ নকশা, আবার প্রাকৃতিক দৃশ্য, এই ভাবে চলে গেছে। যেটুকু আছে দেখা যায় একটি প্যানেলের একটু টুকরোয় গাছের ডালপালা, তার উপরে একটি পাখি, তলায় এক মা-হরিণ বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, আরও দুটো পাখি; প্যানেলের উপর দিকে একটা মাছ, তার সঙ্গে একটা তারা, তারপরে সতরঞ্চের পটি বা প্যানেল।

তার পরের প্যানেলের টুকরোয় একটি মানুষ একহাত তুলে দাঁড়িয়ে, আরেক হাত মাথায়, পিছনে একটি ছোট ছেলে, তারও দু'হাত মাথার উপরে তোলা, পাশে দুটি মাছ, মাঠে একটি মোরগ কঁক কঁক করতে করতে যাচ্ছে। আরো দুটো পাত্রের টুকরোয় দেখা যায় গাছ, মানুষের মাথা আর হাত, একটাতে বোধহয় ফণাতোলা গোখরো সাপ, আরেকটা ডালপালাওলা প্রকাণ্ড গাছ।"[৭] হরপ্পা সংস্কৃতির ছবি সমূহ উন্নত মানব সভ্যতার পরিচয় বহন করে। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, গৃহপালিত ও বুনো জন্তু জানোয়ার, মাছ, পাখি, কাছিম, নকশা, সতরঞ্চ প্রভৃতি এক অনবদ্য জীবন প্রবাহ, সমাজবদ্ধ জীবের, জীবিকাপ্রবাহের সাক্ষ্য বহন করে। মৃৎপাত্র ছাড়াও সিন্ধু সভ্যতার শিল্পীদের চারুকলার নিদর্শন পাওয়া যায় অসংখ্য মূর্তি এবং শীলমোহরের গায়ে উৎকীর্ণ ছবি দেখে। নৃত্যরতা একটি মেয়ে এবং নামাবলী পড়া একজন পুরোহিতের মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাতে চুড়ি পরা, খোঁপা বাঁধা চুল, ত্রিভঙ্গ দেহ, কোমরে হাত রেখে নৃত্যরতা মেয়েটির মূর্তি এই সভ্যতার মানুষের সুকুমার চিন্তা ও নৃত্যজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। শীলমোহরে পাওয়া গেছে পালতোলা জাহাজের ছবি এবং বহুসংখ্যক চিত্রায়িত লিপি যার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি।

হরপ্পা যুগোত্তর কালে ভারতে গ্রামীণ বৈদিক সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। যদিও এ বিষয়ে নতুন বিতর্কও দেখা দিয়েছে। লৌহ যুগের বৈদিক সভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রামীণ ছিল সাহিত্যিক উপাদান তা স্বীকার করে না। পুর বা নগরের উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে বহুস্থানে লক্ষ্যণীয়। বিতর্ক দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করলেও বৈদিক যুগে চিত্রকর ছিলেন এবং প্রাসাদে চিত্রালয় ছিল, এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। সীতার আলেখ্য দর্শন প্রমাণ করে অযোধ্যার প্রাসাদেও চিত্রালয় ছিল। মহাভারতেও বহু ঘটনায় চিত্রের উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে চিত্রের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ এবং তার সঙ্গে সৌন্দর্যের সৃজনশীল সাধনা প্রতি যুগেই অব্যাহত ছিল।

ফিরে পাওয়া রূপের পুরী ঃ অজন্তা, ইলোরা ও বাগ

অতীতের দীর্ঘস্থায়ী সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের নিরন্তর ধ্যানমগ্নতার প্রাপ্তিকে পরবর্তীকালের মানুষ বেমালুম ভুলে যেতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে তার স্মৃতি ও লোকগাথা, এমনটি অজন্তার গুহাগুলির চিত্রসম্ভারের আবিষ্কার বা পুনরায় ফিরে পাওয়ার কাহিনী না জানলে বিশ্বাস করা যেত না। বলা কঠিন, ভারতীয়দের ইতিহাসের প্রতি নিরাসক্তি কিংবা বৌদ্ধযুগের পরিসমাপ্তি এই বিস্মৃতির জন্য দায়ি ছিল কিনা। হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। শুধু বাংলার পাল রাজাদের অধীনে নালন্দা থেকে সোমপুর বা পাহাড়পুর পর্যন্ত অঞ্চল বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র রূপে থেকে যায়। চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর অজন্তাগুহার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পৃষ্ঠপোষণ করার মতো আর কোনও রাজা রইল না। সময়ান্তরে পৃষ্ঠপোষকের অভাবে এবং বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমঅবলুপ্তির কারণে অজন্তা গুহার আশ্রয়

ত্যাগ করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা চলে যেতে বাধ্য হন; কিংবা পুরনো সাধকগোষ্ঠী ক্রমে ইহধাম ত্যাগ করলে এবং নতুন কোনও সাধক গুহাশ্রমে যোগদান না করলে গুহাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই জনশূন্য হয়ে যায়।

পরিত্যক্ত স্থানে আদিদৈবিক ও আদিভৌতিক ভয় আছে ভেবেও সময়ান্তরে সেখানে আর কোনও মানুষ যেতে সাহস পায়নি। এভাবেই সুন্দর সৃষ্টিক্ষেত্র অবক্ষয়িত, পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পরিণত হয়। জানা যায় ঔরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনী মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে অন্ধকার গুহাগুলিতে বিশ্রাম নিয়েছিল। তেমনিভাবে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীও আশ্রয়ের খোঁজে এই গুহাগুলিতে প্রবেশ করে। তবে তাদের মাধ্যমে খবর পাওয়ার ফলেই অজন্তার গুহাগুলি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইউরোপীয় শাসকদের সংস্কৃতিস্পৃহা ও কলাসক্তি ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ রক্ষার্থে তৎপর না হলে অজন্তার কথা হয়তো আরও বহুযুগ অজ্ঞাত থেকে যেত। অজন্তা সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে আলোড়ন তৈরি হয় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে। জেমস ফার্গুসন ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে অজন্তার ওপর তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন। তারপর থেকে প্রায় নব্বই বছর ধরে বিশ্বখ্যাত বহু চিত্রকর অজন্তার ছবির নকল করবার জন্য সেখানে গমন করেন, প্রকাশিত হয় বহু অ্যালবাম এবং তা সংরক্ষিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও যাদুঘরে। মেজর গিল ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ এই বিশ বছরে অজন্তা ছবির যত নকল করে লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন, ক্রিস্টাল প্রাসাদে প্রদর্শনীর সময় এক অগ্নিকাণ্ডে তার প্রায় অধিকাংশ শেষ হয়ে যায়। ডঃ গ্রিফিথস তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ১৮৭২ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত অজন্তা ছবির নকল করে দুখণ্ডে প্রকাশ করেন। নকলগুলি অতিকায় এবং সংখ্যায় ছিল ৩৩৫টি। এই ছবির অধিকাংশ সংরক্ষিত ছিল কেনসিংটন মিউজিয়ামে কিন্তু আর এক অগ্নিকাণ্ডে ১৮৫টি কপি পুড়ে যায়। ভারতীয় শিল্পী নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, মুকুল দে, সৈয়দ আহম্মদ, ফজলউদ্দিন প্রমুখরাও অজন্তার বহু ছবির নকল করেছিলেন। এঁদের উদ্যোগের পেছনে লেডি হেরিংহ্যাম এবং সিস্টার নিবেদিতার অনুপ্রেরণা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা অজন্তা ছবির নকল সংগৃহীত আছে 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম' সহ ভারতের বিভিন্ন যাদুঘরে।

অজন্তা গুহার ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পী সমালোচক বিমল দেব লিখেছেন, "মহারাষ্ট্রের খান্দেশ জেলার ফর্দাপুর শহরের সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত অজন্তা শহর। এই অজন্তা শহরের চার মাইল উত্তর পশ্চিমে ইন্ধ্যাদ্রি পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একপাশে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, আরেক পাশে তাপ্তী নদীর উপত্যকা। ইন্ধ্যাদ্রী পর্বতমালার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বাগোড়া নদী। বাগোড়া সাত জায়গায় সাতটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে সমতল ক্ষেত্রে নেমে এসেছে। শেষ জলপ্রপাতটি যেখানটায় অর্ধবৃত্তের মতো বেঁকে গেছে, সেখানেই রয়েছে অজন্তার গুহাগুলো।"[৮]

অজন্তা গুহার প্রাচীনত্ব ও প্রকৃত সত্য এখনও অজানিত। খুব সম্ভবত সাতবাহন যুগে শুরু হয়েছিল অজন্তা গুহার কাজ। যোগীমারার গুহাগুলি ছিল বহুলাংশে প্রাকৃতিক। কৃত্রিম নির্মাণের কাজ তেমন হয়নি। কিন্তু

অজন্তার গুহা যেমন প্রাকৃতিক তেমনি কৃত্রিম নির্মাণ কাজের মাধ্যমে অভ্যন্তর সুসজ্জিত হয়েছিল। স্তম্ভযুক্ত প্রবেশ দ্বার, মসৃণ দেওয়াল এবং তার গায়ে চিত্রাঙ্কন সবই কৃত্রিম নির্মাণের ফসল। গুহার অমসৃণ পাথুরে দেওয়ালকে যতদূর সম্ভব মসৃণ করে তার ওপর এঁটেল মাটির সঙ্গে গোবর মিশিয়ে কয়েকবার মোটা প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। কয়েকবার প্রলেপের পর দেওয়াল শুকিয়ে শক্ত হত। শুকনো শক্ত দেওয়ালে খড়িমাটি দিয়ে আরও কয়েকবার প্রলেপ দেওয়ার পর বিভিন্ন ধরনের রঙ প্রয়োগ করে ঘটনাকেন্দ্রিক ছবি আঁকা হয়েছিল। অজন্তায় আবিষ্কৃত গুহার সংখ্যা অনেক হলেও বেশ কিছু গুহার ছবি কালের গতিপথে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ষোলটি গুহায় ছবি পাওয়া গিয়েছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ছিল দশটি গুহায় ছবি, এবং এখন ছবি আছে মাত্র ছয়টি গুহায়, বাকি সব কালের গতিপথে ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে ছবিযুক্ত গুহাগুলি হল – ১, ২, ৯, ১০, ১১ এবং ১৭ নং গুহা।

অজন্তার চিত্রকরগণ ভারতীয় ষড়ঙ্গের যথার্থ প্রয়োগ করেছেন ঘটনাকেন্দ্রিক চিত্র রচনায়। ষড়ঙ্গ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বাড়তি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লিখিত হল। রূপভেদ, প্রমাণ, সাদৃশ্য, ভাব, লাবণ্যযোজনা এবং বর্ণিকাভঙ্গ। সৌন্দর্যসৃষ্টির এই ছয়টি অঙ্গ যদিও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই পূর্ণ অনুসরণীয়, চিত্রসৃষ্টিতেও ভাস্কর্যানুরূপ অনুসৃত হয়েছে। রূপভেদ বলতে বোঝায় প্রকৃতির বস্তুসকল, উদ্ভিদ ও জীবজগতের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য যা তাদের রূপগত স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই পার্থক্য বিষয়ে শিল্পীর অভিজ্ঞতা না থাকলে তার তুলিতে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, লতা-পাতা, ফুল-ফল, জীব-জন্তু ও বস্তুসকলের আকৃতির পার্থক্য ও তফাৎ ফুটে উঠবে না। আকৃতিগত পার্থক্যের এই প্রায়োগিক জ্ঞানই রূপভেদ নামে পরিচিত।

রূপভেদ জ্ঞানের সহায়ক হল প্রমাণ। শুধু রূপের পার্থক্য জানলেই হবে না, আকৃতির আপেক্ষিকতায় প্রতিটি বস্তু, জীব, গাছ, লতা, ফুল, ফল অন্যসকল ভিন্ন জাতীয় বস্তু জীব, গাছ, লতা, ফুল, ফলের সঙ্গে আকৃতির পরিমাণে ও তুলনায় কেমন তা জানতে হবে। আকৃতির আয়তনের পার্থক্যই হল প্রকরণ। একই চিত্রে সম-দূরত্বে পুঁটি মাছকে তিমি মাছের সমান, আমকে কাঁঠালের সমান, বেড়ালকে সিংহের সমান করলে হবে না। আকৃতির আয়তনের পার্থক্য স্পষ্ট হতে হবে। আবার দেবমূর্তির আকৃতি দৈত্যের আকৃতি থেকে হবে ভিন্নতর, যেমন মনুষ্যাকৃতি হবে এতদুভয়ের থেকে পার্থক্যানুরূপ।

সাদৃশ্য খুব সম্ভবত ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যকে বিশ্বচারুকলার বিস্তৃত সমুদ্রে বিশেষত্ব প্রদান করেছে। কোনও নারী বা পুরুষের দেহাঙ্গ যথা মুখ, নাক, গলা, ঠোঁট, চোখ, হাত, আঙুল রূপের দিক থেকে আদর্শানুরূপ বা মডেল নয়, এবং আকৃতির মূল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রকৃতির অন্য কোনও জিনিসের অনুসরণে মানুষের দেহাঙ্গকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলে ধরা যায় ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায়,– এই দৃষ্টিভঙ্গিই

হল সাদৃশ্য। ভারতীয় চিত্রে বিশেষ করে অজন্তায় সাদৃশ্যানুযায়ী তিলপুষ্পনাসা, শুকচঞ্চুনাসা, পানপাতার ন্যায় মুখমণ্ডল, পুরুষের সিংহ সদৃশ কটি, গোমুখাকৃতি দেহকাণ্ড, ধনুরাকৃতি বা পদ্মের ন্যায় চোখ, পদ্মচরণ, উল্টো কদলী কাণ্ডের ন্যায় জানু বহুলাংশে অনুসৃত হয়েছে। রূপভেদ, প্রমাণ ও সাদৃশ্য অনুযায়ী ভাস্কর্য ও চিত্রের আকৃতিগত কাঠামো তৈরি হত। পরিপূর্ণতার জন্য বাকি তিনটি অঙ্গও অপরিহার্য অনুসৃত হয়েছে।

সাদৃশ্যর পরেই স্থান ভাব-এর। খরতপ্ত দুপুরে লতাপাতাও ঝিমিয়ে পড়ে, অসুস্থ ক্ষুধার্ত সিংহকেও দুর্বল দেখায়, মাতৃসকাশে গোবৎস আনন্দে লাফালাফি করে, মায়ের কোলে শিশু হাসে, অপরিচিত লোক ভয় দেখালে কাঁদে, জ্ঞানীও আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় বিষন্ন হয়, যুদ্ধে বিজয়ী ও পরাজিতের মুখের ভাব পারস্পরিক বিপরীত, বর্ষায় প্রকৃতি সজীব-সবুজ, কিন্তু শীতে পাংশু, বিরহে বেদনাতুর মুখ মিলনের উচ্ছ্বলতা থেকে স্বতন্ত্র, শরতের মেঘের ছুটির আকাশ কালবৈশাখীর ঘনঘটা কিংবা বর্ষার রোরুদ্যমান আকাশ থেকে আলাদা। ভাবের এরূপ বহুমুখী প্রকাশ স্থান পায় চিত্রকলায়। ভাবের বিকাশে চিত্রবিষয় পরিস্ফুট হয় এবং বিষয়ানুযায়ী চিত্র গতি পায়।

লাবণ্য হল রূপের দ্যুতি বা আভা। অনেক সময় লাবণ্য ভাব নির্ভর। একই মানুষের বিষাদগ্রস্ত ভাবের লাবণ্য তার পরিতৃপ্ত মুখের লাবণ্যের থেকে স্বতন্ত্র। বয়স ও সময়ানুযায়ী কিংবা ঋতুভেদে লাবণ্যের তারতম্য ঘটে। আকাশে সূর্য বর্তমান থাকলেও মেঘলাদিনে, ধোঁয়াশাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে যেমন সূর্যের আলো ও দ্যুতির কমবেশি হয় পৃথিবীতে, তেমনি মানুষটি একই থাকলেও তার ভাবের তারতম্য অনুযায়ী লাবণ্যের পার্থক্য ঘটে সময়ে সময়ে।

বর্ণিকাভঙ্গ হল চিত্রবিষয় অনুযায়ী রঙের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার ও প্রয়োগ। চিত্র বিষয়ানুযায়ী রঙের ভিন্নতা এবং কোথায় কতটুকু রঙ দিতে হবে, তার পরিমাপও নির্ণীত হয় বর্ণিকাভঙ্গের দ্বারা। নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রের পার্থক্য, কাঁচা আম পাকা আমের রঙের তারতম্য বর্ণিকাভঙ্গ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। প্রকৃত বিচারে চিত্রে ভাব ও লাবণ্য সবকিছুই বর্ণিকাভঙ্গ নির্ভর।

অজন্তা চিত্রকলা জাতকের কাহিনী নির্ভর এবং তা নাটকীয় পরম্পরায় ধারাবাহিক ভাবে বিন্যস্ত। জাতকের গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনবদ্যভাবে সম্পূর্ণ বিষয় চরিত্র বিন্যাসে পরিস্ফুট। প্রাসাদ থেকে লোকালয়, বন থেকে প্রাসাদ সর্বত্র মানুষের কর্মকাণ্ড, সামাজিক ও পারিবারিক মিলন, বিরহ, প্রাপ্তি, হতাশা, জন্ম, মৃত্যু, হর্ষ, বিষাদ – সবকিছুই চিত্রিত হয়েছে অজন্তার দেওয়ালে। অজন্তার কাহিনীচিত্র সে কারণে শুধু বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক থাকেনি, হয়ে উঠেছে সার্বিক জীবনকেন্দ্রিক সামাজিক চিত্ররূপ।

অশোক মিত্র অজন্তা চিত্রশৈলী নিয়ে লিখেছেন, "অতীতের উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে ঐতিহ্য ও প্রথাসিদ্ধ রীতির যথাযোগ্য সংশ্লেষণ করে অজন্তাশিল্পী অতি অদ্ভুত নৈপুণ্যে প্রাচীর চিত্রের কাজে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োগ করেন। অজন্তা শিল্পী একইসঙ্গে সমানতালে একদিকে মধ্যবর্তী পিণ্ডের দু'পাশে

প্রতিসাম্যমূলক সরল কম্পোজিশন, অন্যদিকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে যোগসূত্র রচনা কনেক্টিং-লিঙ্ক কম্পোজিশন প্রবর্তন করেন। দুই অংশের মাঝখানে যোগসূত্র হিসেবে কোনও ফিগর এঁকে এক অ্যাখ্যান থেকে আরেক আখ্যানে অবলীলাক্রমে পাড়ি দেন; অন্যদিকে আবার স্থাপত্য নিদর্শনের যথাযোগ্য যোজনায় একই কম্পোজিশনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন স্পষ্ট ভাগ করে দেন যাতে চোখের বিশ্রাম হয়, ছবিতে যতিপাত হয়। শেষে আবার একই দৃশ্যে একাধিক পরিপ্রেক্ষিত বিন্দুর অবতারণার দ্বারা অজন্তা শিল্পী ছবিকে বেগমুখর করেন, উপরন্তু দর্শককে চিত্রের মধ্যস্থলে উপস্থাপিত করেন ও চিত্রের ঘটনায় তাঁকে অংশগ্রহণ করান।"[৯]

অজন্তা চিত্রের নাটকীয় গুণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "অজন্তা চিত্র ও প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেও ক্রমান্বয়ে একের পর এক দৃশ্য আসে, দুই দৃশ্যের মধ্যে কোনও ফাঁক বা যতি পড়ে না, সেখানেও নটনটীর ছন্দ হল মৃদুমন্দ; অথচ মুখের সাবলীল হাবভাবের চেয়ে মাথা হাতের সঞ্চালনেই ভঙ্গি প্রকাশ হয় বেশি। তাই ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের রীতির সঙ্গে অজন্তা চিত্রের যোগসূত্র কম্পোজিশনের টেকনিকের এত মিল।"[১০]

অজন্তা চিত্রের জীবনমুখী বিশ্বজনীনতা, অপরদিকে শাস্ত্রীয় বিধির অলঙ্ঘনীয় বন্ধন ও নান্দনিক দৃষ্টভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতার আপাত পরস্পরবিরোধী অবস্থানের প্রেক্ষিতে শিল্পীর সৃজনশীলতা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চিত্রকে মুক্ত করেছিল সম্ভাবনার অনন্ত দিগন্তে। অশোক মিত্র লিখেছেন, "এই সব বাধা নিষেধের শিকলে বাঁধা থেকেও অজন্তাশিল্পী নির্জন ভয়াল গুহায় সারা বিশ্বের তথা দৃশ্যমান জগতের কত সৌন্দর্য, বিস্ময়, আকুলতা, গভীরতা, আসক্তি, অনুরাগ কি তাগিদে তার কাছে উজাড় করে দিলেন, ভাবলে দর্শকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন বার বার না জেগে পারে না; কি তাগিদে শিল্পী এত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করলেন, সে কি ধ্যান ও ত্যাগের বাণী প্রচার করে সংসারে অনাসৃষ্টি ঘটানোর জন্য, না সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণে সংসারের প্রতি অসীম মমতা ও আসক্তি নতুন করে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে? এক কথায় বলতে গেলে, তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ঐশী জগত ও মাটির পৃথিবীর মিলন ঘটাতে স্বর্গ ও মর্ত্যের পরিণয় সাধনে?"[১১]

ইলোরা ও বাগগুহার দেওয়াল চিত্রগুলিও গুণগত মানে এবং বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে প্রায় অজন্তার অনুরূপ উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। ভারতীয় চিত্রের এই পর্যায় চরম উৎকর্ষ অর্জনের কারণেই মার্গ বা ধ্রুপদী বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

পুঁথির বিষয় চিত্রালোকে ঃ পাল ও সেন যুগে গুজরাটি পুঁথিচিত্র ও জৈন পুঁথিচিত্র

অজন্তা, ইলোরা ও বাগের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে চিত্রকলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই নতুনত্বের গতিপথে ক্রমে হারিয়ে যায় গুহার গায়ে দেওয়াল চিত্রের প্রায় নয়শত বছরের ঐতিহ্য,

সূচিত হয় আর এক অভিনব ধারা। খুব সম্ভবত খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই দেওয়াল চিত্রের পরিবর্তে পুঁথিচিত্রের চর্চা, ধারা ও ঐতিহ্য গড়ে উঠতে থাকে। লক্ষ্যণীয় ভাবে পাল যুগের বাংলা থেকে গুজরাট পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত ভারতের বিপুল অঞ্চলে পুঁথিচিত্রের বিকাশ ঘটে। অজন্তার দেওয়াল চিত্র যেমন মূলত বৌদ্ধধর্ম-কেন্দ্রিক ছিল, তেমনি পুঁথিচিত্রও বহুলাংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। পালযুগের বাংলা বৌদ্ধ ধর্মের এবং তার সমকালীন যুগেই গুজরাটে জৈন পুঁথিচিত্রের অন্তর্ভূমিতে পরিণত হয়। মনে হয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে দেওয়ালচিত্রের ব্যয়সাপেক্ষ ঐতিহ্য স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলা ও গুজরাটে অজন্তার মতো গুহার অস্তিত্ব ছিল না, তাছাড়া পুঁথিচিত্রে যেটুকু আয়োজন ও ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল তা যে কোনও আগ্রহী সম্পদশালী জৈন বা বৌদ্ধ শিষ্য বহন করতে পারতেন; বিপুল রাজ ঐশ্বর্য ও রাজপৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল না। তবে বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক পুঁথিচিত্র পাল যুগের বাংলায় রাজপৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর ও পাহাড়পুর প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষায়তন যেমন রাষ্ট্র কর্তৃক পরিপোষিত হয়েছিল, তেমনি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বাংলায় বৌদ্ধ

পুঁথিচিত্রের চিত্রকরগণ এবং 'চিত্রপুঁথি'র লেখকগণ।

পাল যুগের বাংলায় সাধারণত দুই ধরনের তালপাতা 'খড় তাড়' এবং শ্রীতাড় কিংবা তাল ও তেরেট দিয়ে পুঁথি তৈরি করা হত। আবার তুলোর কাগজ বা 'ভূর্জপত্র' জাত কাগজ দিয়ে নির্মিত হত পুঁথি। পুঁথির পাতায় নিপুণভাবে বিষয় লিপিবদ্ধ হত এবং সমদূরত্বে লেখার পাশে সযত্নে অঙ্কিত হত ছবি। সাধারণত প্রতি পাতায় তিনটি ছবি দু'পাশে দুটি এবং মাঝখানে একটি ছবি অঙ্কিত হত। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম হত, একটি বড় ছবি বা দুটি ছবিও চিত্রিত হত। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো বা সাদা বিভিন্ন রঙে অঙ্কিত ছবিগুলি পুঁথিতে লিখিত বিষয় অনুযায়ী হত। দৃষ্টান্ত হিসেবে চিত্রিত হত ছবি। আবার নেহাত অলংকরণের জন্যও পুঁথিতে ছবির সমাবেশ ঘটানো হত। "পাল যুগের চিত্রিত পুঁথিগুলির অধিকাংশই হল প্রামাণ্য মহাযান গ্রন্থ 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র অনুলিপি। এছাড়া আছে পরবর্তীকালের বজ্রযান মতের 'পঞ্চরক্ষা', 'কারণ্ডব্যূহ', 'কালচক্রযান' প্রমুখ গ্রন্থের অনুলিপি।"[১২]

"পুঁথি নির্বিশেষে চিত্রের বিষয় হল গৌতম বুদ্ধের জীবনের প্রধান আটটি ঘটনা। ১) লুম্বিনী বনে জন্ম। ২) বুদ্ধগয়ায় বোধিলাভ ৩) সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন ৪) কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ ৫) শ্রাবস্তী নগরে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন ৬) সঙ্কাশ্যে স্বর্গাবতরণ ৭) রাজগৃহে নীলগিরি বশীকরণ এবং ৮) বৈশালীর আমন্ত্রণে বানরের মধুদান গ্রহণ। আর মহাযান-বজ্রযান সম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। দেবদেবীর মধ্যে প্রাধান্য

পেয়েছেন প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, লোকনাথ, মৈত্রেয়, মহাকাল, বজ্রপাণি, বসুধারা, কুরুকুল্লা, বুন্দা, বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জুঘোষ প্রমুখ।"[১৩]

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথকে অনুসরণ করে অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী লিখেছেন, "ধর্মপাল দেব এবং দেবপাল দেবের আমলে ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল নামে দুইজন বরেন্দ্রীবাসী শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তারানাথ . . . দুইজনেই ভাস্কর্যে, ধাতুমূর্তি-গড়নে আর চিত্রকর্মে বিশেষ নিপুণ ও পারদর্শী ছিলেন। তারানাথের মতে পিতা ও পুত্র তখনকার শিল্পকলায় দুটি বিশেষ রীতির প্রবর্তন করেন। এই দুই রীতির নাম তিনি দিয়েছেন পূর্বদেশীয় রীতি এবং মধ্যদেশীয় রীতি। ভাস্কর্যে আর ধাতুমূর্তি গড়নে বীতপালকে পূর্বদেশীয় রীতির এবং ধীমানকে মধ্যদেশীয় রীতির প্রবর্তক বলা হয়েছে; চিত্রকর্মে পূর্বদেশীয় মধ্যদেশীয় রীতির প্রবর্তক হচ্ছেন যথাক্রমে ধীমান ও বীতপাল। তারানাথ আরও বলেছেন যে নেপালী ভাস্কর্য ও চিত্রকর্ম পূর্বদেশীয় রীতির অনুসরণে গড়ে উঠেছে।"[১৪] পূর্বদেশ ও মধ্যদেশের অবস্থান সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও বিতর্ক নেই এই বিষয়ে যে পালযুগের বাংলা চিত্রকর্মে উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে মূলকেন্দ্রে পরিণত হয়। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে পাল যুগের চরম প্রতিষ্ঠার যুগে পুঁথিচিত্রে ছবিগুলি তুলনায় ছিল মার্গীয় কিন্তু সময়ান্তরে ক্রম অবক্ষয় সূচিত হয়। তিনি লিখেছেন, "অন্ত্য পর্বের এই পুঁথিগুলির চিত্রে মধ্যযুগীয় দৃষ্টি ও মানসের প্রসার দেখা যায় ভঙ্গশীল, কুটিল রেখা বিন্যাসে আর রঙের সমমাত্রিক ছায়াহীন ব্যবহারে। সাধারণভাবে বলা চলে এই সব পুঁথির চিত্রে রেখা বা রঙের বর্তনাগুণের কোনও চিহ্নই বর্তমান নেই। দণ্ডায়মান মূর্তির অর্ধচন্দ্রাকার রূপ, পার্শ্বগত ভঙ্গিতে একটি চোখের দেহগণ্ডীর বাইরে অতিক্রমণ এই পর্বের পাল চিত্রকলার সাধারণ লক্ষণরূপে পরিচিত করা যায়। চিত্রাঙ্কনেও লক্ষিত হয় মৌল চারুতার অভাব যার ফলে চিত্রগুলি পরিণত হয়েছে ছন্দোবিহীন নকশায় (প্যাটার্ন)। এই সব চিত্রে মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রভাব আর অস্পষ্ট নয় বরং পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান বলা যায়।"[১৫]

বাংলায় পালযুগের সমসাময়িক কালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে জৈন পুঁথিচিত্রের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল গুজরাটে। গুজরাটি পুঁথিচিত্র শৈলীকে তারানাথ 'পশ্চিমী রীতি'র একটি শাখা বলে উল্লেখ করেছেন। গুজরাটি পুঁথিচিত্র মূলত মহাবীর এবং জৈন তীর্থঙ্করদের জীবন কাহিনী 'কল্পসূত্র' অবলম্বনে অঙ্কিত। "তাছাড়া জৈন শিল্পীরা 'কালিকার্থকথা' ও 'বসন্তবিলাস' নামে দুটো কবিতার পুঁথিতেও ছবি এঁকেছেন।"[১৬]

শিল্পী সমালোচক বিমল দেব লিখেছেন, "প্রাচীন জৈনচিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট। বৈশিষ্ট্যটি হোল, ছবিতে প্রতিটি মানুষের মুখ একপাশ থেকে (Profile) আঁকা এবং দু'টো চোখই দেখা যায়। এই লক্ষণ আমরা দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীর Cubist শিল্পীদের ছবির ক্ষেত্রে। Cubist রা একই সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুর সবদিক দেখাতে চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে জৈনচিত্রে ক্রমে গাছপালা, জীবজন্তু ও স্থাপত্যের নিদর্শন স্থান পেয়েছিলো।"[১৭]

তবে জৈন পুঁথিচিত্র পাল যুগের সমসাময়িক কালে সূচিত হলেও তার অঙ্কন ধারা অব্যাহত ছিল পরবর্তী কালেও প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। অনেকের মতে পঞ্চদশ শতকেই জৈন পুঁথিচিত্রের চরম বিকাশ ঘটেছিল যদিও তার শুরু হয়েছিল ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে বলভি শহরে জৈন সাধুদের একটি সভার মাধ্যমে। জৈন পুঁথিচিত্র নিয়ে অশোক মিত্র লিখেছেন, "দিল্লীর জাতীয় মিউজিয়মে রক্ষিত কল্পসূত্র পুঁথি থেকে পশ্চিম ভারতের পুঁথিচিত্রের প্রগতি সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। এই পুঁথিতে বলা আছে গুজরাটিতে চিত্রিত পুঁথিকে বলত 'কলাপুস্তক' এনামেলের নানা উজ্জ্বল রঙে আঁকা ছবিতে ফুটে ওঠে চিত্রকরদের বলিষ্ঠ লেখনরীতি। মানবদেহের সুচারু বৈভব প্রকাশে যাজকীয় ঋজুতা বা কাঠিন্য আর থাকল না, এল নমনীয়তা, মণ্ডন, বর্তন ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস।"[১৮]

ঋতুরাগের রূপরাজত্ব ঃ রাজপুত চিত্রকলা

জৈন পুঁথিচিত্রের ধারা ক্রমশ ক্ষীণতর হলে ভারতে চিত্রকলার ঐতিহ্যে ধারাবাহিকতার নতুন সংযোজন ছিল রাজপুত চিত্রকলা। বিশেষ করে অণুচিত্র; যদিও সাধারণের দেওয়ালচিত্র নগণ্য ছিল না। রাজপুত চিত্রকলা ভারতে মুসলমান শাসনের প্রাক্কালে এবং গতিপথে হিন্দু চিত্রকলার শেষ ঐতিহ্যকে বহন ও পরিপোষণ করেছিল। যদিও বলা হয় রাজপুত চিত্রকলার পরবর্তী ধারা মুঘল দরবারি চিত্রের প্রভাবসিক্ত হয়েছিল; কিন্তু একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল দরবার থেকে মূলত হিন্দু চিত্রকরগণই রাজপুত শাসিত রাজ্যগুলোতে কাজের খোঁজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে কারণে পরবর্তী রাজপুত চিত্রকলায় মুঘল দরবারি প্রভাব কিয়দংশে লক্ষ্যণীয় হলেও তার বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ হিন্দু এবং ভারতীয়। বিমল দেব তাই লিখেছেন, "... রাজপুত চিত্রকলা ভারতীয় জীবনযাত্রায় হিন্দু মনের আধ্যাত্মভাবের কোমল রসে সিক্ত।"[১৯] রাজপুত অণুচিত্র ও লোকায়ত দেওয়ালচিত্র পাশাপাশি শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। অণুচিত্রে রাজকীয় প্রভাব বেশি ছিল কিন্তু সাধারণের দেওয়ালচিত্রে সমাজের সাধারণ মানুষের অভিরুচিকেন্দ্রিক চিত্র বেশি চিত্রিত হয়েছে। তবে সাধারণের অভিরুচি ছিল ধর্মীয় বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক। অশোক মিত্র রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর অভিমত সহ লিখেছেন, "... রাজস্থানের ও হিমাচলপ্রদেশের প্রাসাদগুলির প্রাচীরচিত্র যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের প্রাচীন গুহাচিত্রের রীতি, নীতি, শৈলী ও কম্পোজিশনের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এখন লোকচিত্রে বহতা থেকেছে। এই কারণে আনন্দ কুমারস্বামীর গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন মুঘল চিত্র হচ্ছে শিক্ষা ও চিন্তাপ্রসূত, বিদ্বৎসমাজের জন্য তৈরী। তার মধ্যে আছে নাটক ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি যা ব্যক্তিগত রুচিনির্ভর। রাজপুত চিত্রকলা মূলত রাজকীয় লোকচিত্র, সব শ্রেণীর দর্শককে আনন্দ ও চিত্তের প্রসাদ দেবে; সাধারণ জীবন থেকে অবিচ্ছেদ্য, উপরন্তু এ

চিত্রকলা সম্পূর্ণ মানবিক ভাব, অনুভূতি ও চিন্তা নির্ভর। সেইজন্যই বোধহয় রাজস্থানের যেখানেই গেছি সেখানেই দেখেছি স্থানীয় মিনিয়েচরের নন্দনতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যশৈলী মূলত সাধারণ নাগরিকের গৃহের দেয়াল থেকে প্রাসাদ প্রাচীরের চিত্রের রীতির সঙ্গে নানা সূক্ষ্ম, কিছুটা অনুচ্চারিত বা অর্ধ-উচ্চারিত ভাবে লুকিয়ে আছে। অথচ দুই রীতির আত্মীয়তা অনস্বীকার্য।"[২০]

রাজপুত চিত্রকলার বিষয় ছিল রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, পুরাণ কাব্য বিশেষ করে ভাগবত পুরাণ, রাগমালা, শিব পাবর্তী, বারমাস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন কাহিনী। এই বিষয়গুলির মধ্যে রাগমালা ও বারমাস্যা রাজপুত চিত্রকলাকে অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব দান করেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিনী ও তাদের ভাব ও বিষয় যেমন ঘটনাচিত্রণে গুরুত্ব পেয়েছে ঠিক তেমনি চিত্রিত হয়েছে ঋতুর পরিবর্তনে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট ও মানুষের মনের ভাবের পরিবর্তন। ঋতুর সঙ্গে ভারতীয় রাগ-রাগিনীর সম্পর্ক গভীর। এমনকি ভোর, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, গভীর রাত, বৃষ্টিস্নাত দিন প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন সুরের বা রাগরাগিনীর সংযোগ অন্তঃস্থিত। বিভিন্ন ঋতুতে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের পৃথক পৃথক সুরই হল রাগ; এবং প্রতিটি রাগের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন রাগিনীর। এক অর্থে ছয় ঋতুতে ছয় রাগ এবং প্রতিটি রাগের আবার পাঁচটি ছ'টি ভাব থেকে সর্বমোট ত্রিশ থেকে ছত্রিশটি রাগিনী। রাগিনীগুলি রাগের স্ত্রী। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণত ভাগ না দেখিয়ে কিংবা অধীনস্থ না দেখিয়ে স্ত্রী হিসেবে ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা প্রচলিত আছে। তাই কথায় বলে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিনী। রাগ ও রাগিনীগুলির মিলনে আবার সৃষ্টি হয়েছে বহুসংখ্যক সন্তানাদি বা ভিন্নরূপ সুরের ধারা।

ঋতু ও লগ্ন পরিবর্তনে প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় মানুষের দৈহিক রূপ-লাবণ্যের এবং মনের ভাবের, চাহিদা ও রুচির। বর্ষায় অতি সজীব ও সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দৃশ্য মনের তন্ত্রীতে যে ভাব ও রাগ-রাগিনীর সুর ঝংকৃত করবে, শুষ্ক, শীতল, পাংশু শীতে তা সম্ভব হবে না। আবার শীতেরও নিজস্ব রূপ ও ভাব আছে, সুর আছে। এক কথায় বলা যায় বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপ মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়ে বিবিধ ভাব ও সুরের বা রাগ-রাগিনীর সৃষ্টি করে। মানুষের মনে ঋতু ও প্রকৃতির যে ভাষা ঝংকৃত হয়– তাই সুর, রাগ-রাগিনী।

ঋতুভেদ ছাড়াও সকাল ও সন্ধ্যাতেও সুর বা বিশেষ করে রাগিনীর পরিবর্তন হয়। আবার সুখ ও দুঃখের, আনন্দ ও বেদনার ভাব ও ভাষা যেমন ভিন্ন হয়, তেমনি সুরগুলিও ভিন্নতর। রাজপুত চিত্রে ঋতুর পরিবর্তন, ভাবের রূপান্তর এবং রাগ-রাগিনীর ভিন্নতা মানুষের নাটকীয় উপস্থাপনায় স্থান পেয়েছে। সময়ের

গতিপথে ঋতু ছাড়িয়েও রাগের অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছিল সুর সাধকের দ্বারা। ছয় রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও তিনটি রাগ। এভাবেই রাগের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল নয়টি। কৃষ্ণলাল দাস লিখেছেন, "রাগমালার মধ্যে ছয়টি রাগ এবং ছত্রিশটি রাগিনী। প্রত্যেক রাগের ছয়জন করে পত্নী কল্পিত হয়েছে। পুরুষ রাগ যথাক্রমে শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও নট্টনারায়ণ, মালকোশ, হিন্দোল, দীপক এরা আদি রাগমালার অন্তর্গত না হলেও পুরুষ রাগমালার অন্তর্গত। ছত্রিশটি রাগিনীর মধ্যে মালশ্রী, ত্রিবণী, হিন্দোলী, গুর্জরী, ভৈরবী, তোড়ি, দেবকিরী, ললিতা, মধুমাধবী, মল্লারী, পাহাড়ি, দেশী প্রভৃতি সুরগুলি নারীরূপে কল্পিত হয়।"[২১]

রাগরাগিনী ও রাজপুত চিত্রকলার রূপার্থক ও বিষয়াত্মক সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিয়ে কৃষ্ণলাল দাস লিখেছেন, "সঙ্গীতের সুরের হিল্লোলে শ্রোতার চিত্রে যে ভাবময় চিত্ররূপের সৃষ্টি করে তাকে রাজস্থানী শিল্পীরা রেখা ছন্দ ও বর্ণে অনুরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন। গায়ক যখন সুরের মাধ্যমে রাগ ও রাগিনীর রূপ ও বর্ণনা ধীরে ধীরে বিস্তার করতে থাকেন অর্থাৎ সাধক যখন সুরের মাধ্যমে উপাস্যকে বন্দনা করেন তখন ভক্তের আকুলতার সঙ্গে সুরতরঙ্গ বাতাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তাতে সূক্ষ্ম জগতে একটা চিত্ররূপের সৃষ্টি হয়। মানুষের কর্মে চিন্তায় ও সূক্ষ্ম জগতে তা নিয়ত প্রতিফলিত হয়। এই ছায়াচিত্র একমাত্র সিদ্ধ ও শক্তিমান পুরুষরাই দেখতে পান।"[২২] "রাগচিত্রগুলি এক ভাবে মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। চিত্রগুণে, ভাবাদর্শে, পারিপাট্যে, রঙ ও রেখা বিন্যাসে এই চিত্রগুলি রাজপুত জাতির একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। চিত্রের মাধ্যমে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, গৃহ, আসবাব, তৈজসপত্র, জীবনযাত্রার ধারা, পরিবেশ, এমনকি ভূমি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি পর্যন্ত শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি প্রভৃতি বহু বিতর্কমূলক বিষয় বাদ দিয়ে শিল্পের দিক থেকে রাগমালা চিত্রের কলাকারদের অনেক নিয়মনিষ্ঠা ও সংযম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। . . . রাগরাগিনী কখনও রাজারাণী বা রাজপুত্র-রাজকন্যারূপে, আবার কোথাও শিব, কৃষ্ণ বা রুদ্র দেবতারূপে পরিকল্পিত হয়েছেন। সঙ্গীতকলা ব্রহ্ম উপলব্ধির একটি সোপান। শব্দ যে ব্রহ্মময় চৈতন্যস্বরূপ, এই গভীর তত্ত্ববোধ থেকেই রাগ-রাগিনীকে কলাকারগণ শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করেছেন। . . . বর্ণ প্রয়োগ ব্যাপারে শিল্পীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি থাকলেও তাঁরা চিত্রের ভাব ও বর্ণনাকে কোথাও অতিক্রম করার চেষ্টা করেননি। চিত্রের সামগ্রিক বর্ণিল সুরের মধ্যে অপর কোনও ক্ষুদ্র সুর বিচ্ছিন্নভাবে প্রাধান্যলাভ করে তীব্রতর হয়ে ওঠেনি। রঙের টেক্সচারের মধ্যে সুরসঙ্গতি অতি নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।"[২৩]

অশোক মিত্র রাজপুত চিত্রের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে লিখেছেন, "রাজপুত চিত্র সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বিষয় হিসেবে দেশ বা উৎপত্তিস্থল অনুসারে; যুগ অনুসারে। . . . ভূগোল অনুসারে রাজপুত ছবি দুটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে রাজস্থানী, দ্বিতীয় হচ্ছে পাহাড়ী। রাজস্থানী রীতির মধ্যে পড়ে পূর্বদেশের বুন্দেলা (ভাটিয়া ও অর্চা রাজ্য), উদয়পুর, বুঁদি, জয়পুর, অম্বর, আজমীর, বিকানীর। . . . পাহাড়ী রীতির মধ্যে পড়ে বাশোলী, কাংড়া, কুলু, গুলের, চাম্বা, জম্মু, পুঞ্চ, মাণ্ডি, রামপুর, তেহরি, গাড়োয়াল।"[২৪]

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে রাজপুত চিত্রের দুটি ভৌগোলিক ও রীতিগত ভাগ প্রথম সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন স্বনামধন্য ডঃ আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী।

রাজস্থানী চিত্রে ভাগবত পুরাণ, বারমাস্যা এবং রাগমালা চিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। মেবার ছিল রাজস্থানী চিত্রের মূল কেন্দ্র। পাহাড়ি চিত্রের শ্রেষ্ঠ রীতি ছিল কাংড়া। বিমল মিত্র লিখেছেন, "কাংড়া রীতির মধ্যে স্ত্রী দেহের লীলায়িত ভঙ্গি একটি মুখ্য ব্যাপার। শক্তিশালী লাইনের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা ছন্দোময় দেহভঙ্গিমায় প্রকাশ পায় এক পাপশূন্যতা ও উন্মুক্ত যৌনক্ষুধা।"[২৫]

রাজপুত চিত্রের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে বিমল দেব মন্তব্য করেছেন, "রাজপুত শিল্পীদের কাছে সব মানুষই হচ্ছে প্রতীক এবং প্রকৃতি হচ্ছে প্রতীকমূলক। শিল্পী যখন একজন স্ত্রী লোকের ছবি আঁকেন তখন ঐ স্ত্রী লোকটি হয়ে ওঠে গোটা নারী জাতির প্রতীক। শিল্পীর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য থাকে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা। প্রকৃতি, প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী ও আবেগের সহজ সরল প্রকাশের মহৎ চিন্তার প্রতিফলন রাজপুত চিত্রের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। রাজপুত চিত্রে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ খুব পরিষ্কার। যেমন লাল রঙে উত্তেজনার প্রকাশ, হলুদে বিস্ময়কর ভাব, বাদামিতে কাম ভাব। এ ভাবে একেকটি রঙে একেকটি ভাব। রাজপুত চিত্রকলায় রাগমালা চিত্র চিত্রশিল্পের জগতে একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষে রাগমালা এমন একধরনের চিত্র যার মধ্যে চিত্র কাব্য ও সঙ্গীত একদেহে লীন।"[২৬]

দরবারি সব চিত্রসম্ভার ঃ মুঘল চিত্রকলা

মুঘল চিত্রকলা পৃষ্ঠপোষণ, রুচি, বিষয়বস্তু, উপভোগ ও সংরক্ষণ সমস্ত দিক বিচারে দরবারি ও রাজকীয়। রাজ পৃষ্ঠপোষণে, রাজ দরবারে, রাজকীয় রুচি অনুযায়ী দরবারি বিষয় এবং রাজকীয় কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে রচিত চিত্রাবলী দরবারেই সংরক্ষিত হয়েছিল রাজপুরুষদের উপভোগের জন্য। সাধারণের কোনও অংশগ্রহণ এই শিল্প-বিষয়ে ছিল না, যদিও শিল্পী বা চিত্রকরগণের অনেকেই সাধারণ মানুষের পর্যায় থেকে দরবারি চিত্রকর রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজপুত চিত্র বহুলাংশে দরবারি চিত্রকরদের দ্বারা রচিত হলেও তার বিষয়াত্মক দিক দরবারি বা রাজকীয় রুচি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়নি। সাধারণের বিশ্বাস, ধর্মজীবন এবং সামাজিক কৃষ্টির ঐতিহ্য রাজপুত চিত্রের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল শিল্পীর তুলি ও কলমে। রাজপুত চিত্র ও মুঘল চিত্রের পার্থক্য সম্পর্কে আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর বক্তব্য তুলে ধরে অশোক মিত্র লিখেছেন, "১৯১৬ সনে আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর বিখ্যাত বই 'রাজপুত পেন্টিং' দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। রাজপুত চিত্রকলা বিষয়ে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক, তার উপরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধে বইয়ের প্রতিটি ছত্র উজ্জ্বল। এই বইয়ে

তিনি মুঘল চিত্ররীতি আর রাজপুত চিত্রনীতি যে নিতান্ত দুটি ভিন্ন জগতের, দুইয়ের মধ্যে না ভাবে না রীতিতে কোনও সম্বন্ধই নেই, সে কথা দৃঢ়ভাবে বলেন। এ ব্যাপারে 'রাজপুত পেন্টিং' বইটির প্রথম খণ্ডের ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা থেকে তাঁর বক্তব্য তর্জমা করে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল, তাতে তাঁর বক্তব্য আমরা শুনতে পাব : 'মুঘল চিত্রকলা আসলে মিনিয়েচর চিত্ররীতি, যেমন পারসিক চিত্রকলা উদ্ভাস রীতি। কদাচিৎ সেখানে মুঘল চিত্র দেখা যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় মিনিয়েচরকে গুণ করে বাড়িয়ে আঁকা হয়েছে। রাজা ওমরাহ সমঝদারদের গ্রন্থাগারের বইয়ের মধ্যেই মুঘল চিত্রকলা মানায় ভাল, কিন্তু হিন্দু চিত্রকলা মন্দির, প্রাসাদ, সাধারণের ব্যবহার্য হর্ম্যের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার চিহ্ন সে সব জায়গায় এখনও বর্তমান। মুঘল চিত্রকলা জাগতিক, বর্তমান মুহূর্তের উপর নির্ভর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে প্রগাঢ়ভাবে কৌতূহলী। জীবনকে আদর্শ ছাঁচে ফেলে না, কিন্তু তবুও জীবনের মহান ও জাঁকজমকপূর্ণ একটি দিকের সুকুমার, সুচারু প্রতিচ্ছবি। স্তব্ধ নয়, নাটকীয়; যৌবনোচ্ছল, পরীক্ষা ভালবাসে, পরিপাক করতে প্রস্তুত। যেমন জৌলুস তেমনি মনোহারী কিন্তু ক্বচিৎ জীবনের গভীর উৎস পর্যন্ত নয়। মুঘল চিত্রের সবচেয়ে সাফল্য প্রতিকৃতিতে, দরবারের জমকালো জাঁকজমক সবকটি বিষয়ই জাগতিক, এবং যদিও অবশ্য নিছক পর্যবেক্ষণের তীব্রতায়, গভীর আবেগময় নক্‌শার জোরে কিছু কিছু এক ছবি, যেমন অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'মুমূর্ষুলোকের' ছবিটি মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে অক্লেশে পৌঁছেছে, তবুও মুঘল শিল্পের চিত্রবিষয় মুখ্যত নিতান্ত রাজা উজিরের পক্ষে ভাল লাগার কথা। অন্যপক্ষে রাজপুত চিত্রের প্রধান পার্থক্য যে প্রথমটি অভিজাত ও জাতশিল্পীর দরবারী কাজ; দ্বিতীয়টি দেবদেবীর স্তরভেদে যুগপৎ আপ্লুত অথচ লৌকিক; এবং প্রায়ই দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত সাধারণ ঘটনার মধ্যে অনন্ত অর্থের মরমিয়া রসে সিক্ত। মুঘল সভাসদদের যেমন রাখল ও গোপিনীদের চিত্রে উৎসাহ পাবার কথা নয় তেমনি বৈষ্ণবদেরও হাতির লড়াই ভাল লাগার কথা নয়। এটা মনে রাখা দরকার যে মুঘল চিত্রকলা নিতান্তই রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর ছিল; ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর আর টিঁকল না; আকবরের রাজত্বের সঙ্গে তার জন্ম, আর মোটামুটি ১৭০৬ সনে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গেই তার মৃত্যু।"[২৭]

মুঘল চিত্র মূলত সূক্ষ্মালেখ্য বা অণুচিত্র (Miniature), যদিও ফতেপুর সিক্রিতে কিছু দেওয়ালচিত্র আছে। অ্যালবামের আকৃতির পুঁথি বা পুঁথির আকৃতির অ্যালবামে ছবিগুলি অঙ্গিত হয়েছিল। সম্রাট, রাজপুরুষ, ওমরাহ এবং রাজান্তপুরের নারীগণ পাতার পর পাতায় চিত্রিত ছবিগুলি উপভোগ করতেন। মুঘল চিত্রের একটি

বিশেষ দিক হল ইতিহাসের কালানুবর্তিতা। সম্রাট বাবরের সময় থেকেই মুঘল চিত্রধারার সৃষ্টি। পরবর্তীকালে কোন সম্রাটের যুগে কোন কোন শিল্পী কি কি ছবি এঁকেছিলেন তার মোটামুটি ইতিহাস অনবদ্য। তাছাড়া মুঘল শিল্পীদের নাম এবং অনেকের জীবনীও বিস্তৃত জানা যায়। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে যেমন ছিলেন মুসলমান শিল্পী, তেমনি হিন্দুদের সংখ্যাও ছিল লক্ষ্যণীয়। বাবর থেকে আকবরের সময়ে মুসলমান শিল্পীদের অধিকাংশ ছিলেন পারসিক। ফলে মুঘল চিত্রকলায় পারসিক ও ভারতীয় চিত্ররীতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং নান্দনিক চেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে মুঘল চিত্র ছিল সম্পূর্ণ দরবারি। সেকালে সমাজ, মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রাম মুঘল চিত্রকলায় প্রতিফলিত হয়নি। মুঘল চিত্রের বিষয় জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের দৃশ্য, সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন রাজকীয় উপাখ্যানের ছবি, বিভিন্ন যুদ্ধে রাজপুরুষ ও রাজপুত্রদের বীরত্বের দৃশ্য, জঙ্গলে শিকারের দৃশ্য, এবং বিভিন্ন জীবজন্তু ও পাখির ছবি। প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট, বিশেষ করে পার্শ্বপ্রতিকৃতি বা প্রোফাইল ছিল মুঘল চিত্রনিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল পুঁথিচিত্র ছিল সমৃদ্ধ। ছবির কিনারে চিত্রবৎ হস্তলিপি বা 'ক্যালিগ্রাফি'ও মুঘল চিত্রের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ উল্লেখ্য।

সম্রাট বাবর কিংবা বিশেষ করে সম্রাট আকবর থেকে ঔরঙ্গজেবের শেষদিন পর্যন্ত প্রায় দু'শো বছরে মুঘল চিত্রকলার যুগ বহুসংখ্যক পারসিক ও ভারতীয় চিত্রকরের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। মুঘল চিত্রের ঐতিহ্য ইন্দো-পারসিক হলেও প্রকৃত অর্থে ভারতীয় চিত্রের ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করেছে। অজন্তার যুগের পর পালযুগের চিত্রকলা, গুজরাটি পুঁথিচিত্র এবং রাজপুত চিত্র যেমন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, ঠিক তেমনি মুঘল চিত্রকলাও একটি নিজস্ব ধারা তৈরির মাধ্যমে ভারতীয় চিত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে, যদিও মুঘল চিত্র রাজপুতচিত্রের সমসাময়িক। ঔরঙ্গজেব উত্তরকালে মুঘলশিল্পীদের অনেকেই বিভিন্ন রাজপুত দরবারে চিত্রকর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে রাজস্থানী ও কাংড়ার চিত্রকলাকে কিয়দংশে প্রভাবিত করেছিলেন।

মুঘলচিত্রে রঙের প্রাচুর্য ও ভিন্নতা অতি আকর্ষণীয়। রঙ সব প্রাকৃতিক হলেও ঝকঝকে আলোময়। অশোক মিত্র লিখেছেন, "সারা ছবিটি সাধারণত হত প্রাচ্যের ঝকমক করা লাল নীল আর সোনালির জড়োয়া। ওরই মধ্যে আবার রঙের সেরা রঙ হত নীল, যা আসত ইন্দ্রনীল আব ল্যাপিজ ল্যাজুলাই পাথর থেকে।"[২৮] চিত্রে রঙের বাহার এত বেশি যে সেখানে আলো-আঁধারের পার্থক্য এবং নিকট-দূরের গভীরতা হারিয়ে গেছে। রঙ যেন সর্বত্র উজ্জ্বল – কাছেও যেমন দূরেও তেমন। দূরের দৃশ্য অস্পষ্ট না হওয়ার জন্য কিংবা রঙ সর্বত্র সমান হওয়ার জন্য অনেকে মুঘল চিত্রে পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিতের অনুপস্থিতি যেমন অনুভব করেছেন তেমনি ইমপ্রেশনিজমের এক অভিনব রূপকেও খুঁজে পেয়েছেন। রঙ উজ্জ্বল হলেও রঙের উগ্রতা ছিল না মুঘল চিত্রকলায়। রেখার যাদুচিত্রে প্রতিটি বিষয়বস্তুর পরিসীমা যেমন নির্ণয় করেছে, আবার রেখার অবিভাজ্যতা সমগ্র চিত্রপটকে সাংগঠনিক ঐক্য দান করেছে। কোথাও রঙ হালকা হয়েছে কমনীয়তা রক্ষার্থে। রঙের পারিপাট্যতায় রেখা যেন হারিয়ে গেছে এবং পরস্পর রঙগুলি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক হয়ে

উঠেছে। সেদিক বিচারে রঙের ভারসাম্য ছিল বাস্তবতার নিরিখে আর রঙও ছিল সব প্রাকৃতিক। মুঘল চিত্রে প্রকৃতিনির্ভর রঙ যত উজ্জ্বল সম্ভব ততটাই হয়েছিল; আবার রেখা রঙের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছিল। তবে রঙ উজ্জ্বল হলেও রাসায়নিক রঙ ব্যবহারে বর্তমান যুগের চিত্রে যে চকচকে ভাব আনয়ন করা সম্ভব তা মুঘল চিত্রে ছিল না, এবং তা কাম্যও ছিল না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে চাকচিক্য বৃদ্ধির জন্য সোনার জলও ব্যবহৃত হত। হয়ত সোনার জলের ব্যবহার একটি পারসিক প্রয়োগ পদ্ধতি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রতিকৃতি চিত্রণ এবং প্রকৃতির দৃশ্যাঙ্কনে রঙের ব্যবহারে পাশ্চাত্যের প্রভাব ক্ষেত্র বিশেষে অনুভূত হয়েছিল তবে সেই প্রভাব কখনও মুঘল ঐতিহ্যকে আদৃত করতে পারেনি।

মুঘল চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত না থাকাতে নিকট ও দূরের সম্পর্ক ও পার্থক্য রঙের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলো-আঁধার নয় শুধু রঙের ভিন্নতার মাধ্যমেই তা করা হয়েছে; তবে এ ধরনের প্রয়োগ রীতিও সার্বিক ছিল না। পেছনের দৃশ্যপটকে ওপরে তুলে দেয়া হয়েছে। সামনের ও পেছনের দৃশ্যমান বস্তু, মানুষ, জীবজন্তু, ঘরবাড়ি, পাহাড়, জলাশয়, জঙ্গল – নীচ থেকে ওপরের দিকে সাজানো হয়েছে। চিত্রপটে কাছের জিনিস নীচে এবং দূরের জিনিস পেছনে উপরে আঁকা হয়েছে। শিল্পী যেন আকাশ থেকে সমস্ত কিছুকে একসঙ্গে দেখে বায়বীয় অবস্থানেই কাছের ও দূরের জিনিসকে নীচে ও ওপরে সাজিয়েছেন; যেন দূর নিকট একসঙ্গেই সমানভাবে দেখা যায়। সে কারণেই মুঘল চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতকে বায়বীয় বা আকাশ-প্রেক্ষিত বলা হয়।

মুঘল চিত্রকলার সূচনা প্রকৃতপক্ষে বাবরের সংক্ষিপ্ত শাসনকালেই হয়েছিল। 'বাবরনামা'য় সচিত্র পাণ্ডুলিপি বাবরের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চিত্র-নিদর্শন। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে এই পাণ্ডুলিপি। দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে 'বাবরনামা'র ১৪৪ খানি চিত্র সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন ধরনের ফুল, গাছপালা, ঘটনাচিত্র, যুদ্ধচিত্র, শিকারচিত্র, ভোজচিত্র এবং গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্র 'বাবরনামা'র চিত্রাবলীতে প্রাধান্য পেয়েছে। 'বাবরনামা'য় চিত্রকরদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে মুসলমান শিল্পীদের পাশে হিন্দু শিল্পীদের নাম সমুজ্জ্বল। এই শিল্পীরা ছিলেন – "আবদুল্লা, খুরদ, কলন, ভগবন্ত, ভূরা, ধনু, দেবগুজরাটী, ধনরাজ, ফারুক, গোবিন্দ, জামসেদ, জগন্নাথ, খসরুকুলী, খিজির খেল, ইব্রাহিম, কাহার, নক্‌খাস, খেম, কেশু, মনসূর, মনোহর, মুকেশ, মুখলেস, নন্দ গোয়ালিয়রী, নামা, পদরথ, ফেস, গুজরাটি, রামদাস, রসিক, রস, শঙ্কর গুজরাটি, শিবদাস, স্যানাউল্লা, সরোযান, শ্যাম, সুজন, সুরদাস, সুরগুজরাটি, তীর্য, তলক, খুরদ, থরিয়ল।"[২৯] শিল্পীদের নামের তালিকায় ভারতীয় তথা হিন্দু শিল্পীদের নাম লক্ষ্যণীয় বলে এই ধারণায় বিশ্বাসী হওয়া যায় যে বাবর ভারতের অনেক কিছু পছন্দ না করলেও এদেশের শিল্পীদের অপছন্দ করেননি। এ বিষয় থেকে আরও প্রকাশিত হয়, বাবর-পূর্ব যুগে ভারতে চিত্রচর্চা আভিজাত্যের স্তরেই ছিল যা সংস্কৃতিমনস্ক বাবর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এদেশীয় শিল্পীদের চিত্রকর্মে নিয়োগ করে।

মুসলমান ও হিন্দু কিংবা পারসিক ও ভারতীয় শিল্পীদের পারস্পরিক প্রভাব ও সহায়তায় মুঘল চিত্রকলার যে ধারা তৈরি হয়েছিল তা সময়ান্তরে বিশেষ করে আকবরের সময় থেকে আরও সুশৃঙ্খল ঐতিহ্যবাহী ও নির্ভরযোগ্য ধারা যা চিত্ররীতি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কালের গতিপথে ইন্দো-পারসিক মুঘল চিত্ররীতি আরও বেশি ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় চরিত্র অর্জন করে। 'আকবরনামা'র প্রায় ১১৬টি সন্নিবেশিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান ৫৬ জন চিত্রকরের দ্বারা। এই চিত্রকরদের নাম ছিল, –

"অনন্ত আসী, মুসকীন, বাবুনক্কাস, বানদী, বানোয়ারী, কলাস, খুরদ, বাসোয়ান, ভবানী, কলান, ভগবান, ভুরা, চৈতরমণ, দুর্গ ধর্মদাস, ধানোযান, ফারুক, বেগ, হোসেন, আক্কাস, কেশু, খেমকরণ, কেশু খুরদ, কানহা, লাল, মাদ্ধু, কালান, মুকুন্দ, মিসকীন, মহেশ, মাদ্ধুখুরদ, মনসুর, শাহ মহম্মদ, মনোহর, নারায়ণ, নন্দ, রামদাস, নামান, নরসিংহ, নানহা, নন্দ গোয়ালিয়রী, পারস, কুতুবচিলা, সানাউল্লা, সারোয়ান, সুরদাস, শঙ্কর, তুলসী, কলন, তীর্থ, তারা। প্রেমজী ও গুজরাটী নন্দী ছিলেন রামদাসের পুত্র, আসী ছিলেন মুসকীনের ভাই।"[৩০]

প্রকৃতপক্ষে আকবরের সময়ে চিত্রকরগণ যৌথভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চিত্রাঙ্কন করতেন। এক একজন শিল্পী যে বিষয়ে বেশি ক্ষমতাশালী তিনি সেই অংশটি অঙ্কন করতেন। এর ফলে চিত্রে সকল সর্বোৎকৃষ্ট অবদান সম্মিলিত হত। আকবরের রাজত্বে মুঘল স্কুলে যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয়েছিল আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'আমীর হামজা', 'চেঙ্গিসনামা', 'জাফরনামা', 'রজমনামা', 'আয়ার দানিশ', 'নল-দময়ন্তী', 'কালিলা-ওয়া-দিমনা' প্রভৃতি। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান আকবরের সময়ে মুঘল চিত্রে রাজপুত চিত্রের প্রভাব ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ছিল মুঘল চিত্রকলার সুবর্ণযুগ। সম্রাট স্বয়ং চিত্রকরদের পাশে থেকে তাদের নিকট হতে সেরা কাজটি আদায় করে নিতেন। সম্রাট ও শিল্পীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তিনি তাঁর পিতার সময়ের শিল্পীদের যৌথ শিল্প প্রচেষ্টাকেও টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। শিল্পীদের দক্ষতা বিষয়ে সম্রাটের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ইংলন্ডের শিল্পী আইজাক অলিভার অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র উপহার হিসেবে প্রদান করলে সম্রাট খুশি হয়ে বলেছিলেন তাঁর দরবারেও এমন দক্ষ শিল্পী আছে যাঁরা ইংলন্ডের পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনে সফল হবে। টমাস রো সন্দেহ প্রকাশ করলে সম্রাটের নির্দেশে মুঘল দরবারের আটজন শিল্পী অলিভারের চিত্রের অনুরূপ আরও আটটি চিত্র অঙ্কন করে টমাস রো'র সামনে হাজির করলে রো অলিভারের মূল চিত্রটি অতি কষ্টে দীর্ঘ সময় পর চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রাণীচিত্র, উদ্ভিদ, ফুল ও লতাপাতার চিত্রাঙ্কনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শিল্পী মনসুর। শিকার চিত্রও এই সময়ে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রতিকৃতি চিত্রেও জাহাঙ্গীরের সময় ছিল গৌরবোজ্জ্বল। স্বয়ং সম্রাটের বহু প্রতিকৃতি চিত্রিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে মুঘল চিত্রকলায় ভারতীয়

শিল্পীর সংখ্যাধিক্য ছিল; এবং প্রতিকৃতি তৈরির কাজও তাদের হাতেই বেশি হয়েছে। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান এই সময়ের মুঘল শিল্পীদের সম্পর্কে লিখেছেন, "মুঘল চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা মীর সৈয়দ আলী খাওয়াজা আবদুস সামাদ মৃত্যুবরণ করিলে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ফারুক বেগ কালমাক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উপরন্তু মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ফারুক বেগ কালমাক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উপরন্তু মধ্য-এশিয়া হইতে মুহম্মদ নাদির এবং মুহম্মদ মুরাদ নামে দুইজন প্রতিভাশালী চিত্রকর মুঘল দরবারে আগমন করেন। শাহজাহানের আমলে আগত অপর একজন বৈদেশিক শিল্পী ব্যতীত মুঘল চিত্রশালায় অপর কোন অভারতীয় চিত্রকর ছিল না এবং ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দু চিত্রকরদের প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় দুইজন ক্ষণজন্মা মুসলিম চিত্রশিল্পীর সৃজনশীল শিল্পচর্চায় মুঘল চিত্রকলার প্রকৃত বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহারা হইতেছেন আগা রিজার পুত্র আবুল হাসান এবং ওস্তাদ মনসুর। অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ জাহাঙ্গীর আবুল হাসানকে 'নাদির-উজ-জামান' অর্থাৎ 'যুগের শ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করেন। . . . মনসুরের শিল্পকর্মের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর তাহাকে 'নাদির-উল-আসর' অর্থাৎ যুগের বিস্ময় উপাধিতে ভূষিত করেন। আকবরের হিন্দু চিত্রকরদের মত জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় রাজপুত রীতিতে দক্ষ অসংখ্য শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাবশালী ছিলেন বিসনদাস, তারাচাঁদ, জগন্নাথ, মনোহর ও গোবর্দ্ধন।"[৩১]

মুঘল চিত্রকলা ইন্দো-পারসিক চিত্ররীতি হিসেবে সূচিত হলেও সময়ান্তরে ভারতীয় চিত্ররূপেই প্রতিভাত হয়, কারণ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীগণ পারসিক চিত্ররীতি একদিকে যেমন আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, অপরদিকে পারসিক চিত্রকরগণও দীর্ঘদিন দরবারে থেকে ভারতীয় চিত্র-রীতি, চিত্র-বিষয়, চিত্র-শৈলী ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হন। তাছাড়া সময়ে পারসিক চিত্রকরগণ দরবারি চিত্রচর্চা করতে গিয়েও রুচির দিক থেকে ভারতীয় পরিবেশ, চাহিদা ও আবেদনকে অস্বীকার করতে পারেননি, কারণ তাঁরা ও তাঁদের বংশধরগণ কালের গতিপথে ভারতীয় হয়ে যান। যদিও একথা সত্য যে মুঘল চিত্রশালায় চিত্রবিষয় নির্ধারণে শিল্পীর স্বাধীনতা ছিল না; কিন্তু চিত্রের রূপার্থক দিক সম্রাট বা পৃষ্ঠপোষকের দ্বারা নির্ণিত হত না। শিল্পীর তুলি ও কলম ছিল মূল নির্ণায়ক। তাছাড়া আকবরের সময় থেকে মুঘল সম্রাট ও রাজপুরুষগণও ছিলেন বহুলাংশে কিংবা পূর্ণ ভারতীয়। আকবরের দরবারে ১২ জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর ৮ জন ছিলেন রাজপুত। এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ছিলেন হিন্দু রমণীর সন্তান। ফলে তাঁদের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পাদর্শে ভারতীয় রুচি প্রাধান্য পেয়েছিল সন্দেহ নেই।

সাধারণের অতীত ধারা ঃ লোকায়ত চিত্রকলা

কাপড়ের ওপর অঙ্কিত চিত্রকে বলা হয় পটচিত্র। সংস্কৃত শব্দ 'পট্ট' থেকে পট কথাটি এসেছে। 'পট্ট' কথাটির অর্থ কাপড়। পটচিত্র কাপড়ের ফালির ওপর আঁকা হয়। পূর্বে কাপড়ের ফালির ওপর খড়িমাটি দিয়ে সাদা জমি তৈরি করা হত, পরবর্তীতে কাগজের প্রচলন হলে কাপড়ের ওপর কাগজ সেঁটে ছবির জমি তৈরি করা হয়। এই সমস্ত পটের আয়তন দু'রকমের হয়, ১। চৌকস পট (আয়তাকার) এবং ২। জড়ানো পট (দু'হাত চওড়া ও বারো থেকে পঁচিশ হাত লম্বা।) শাস্ত্রে পটচিত্র অঙ্কনের নির্দেশ দেওয়া আছে। এই অঙ্কনের রীতি প্রাচীনতম উৎকীর্ণ ভাস্কর্যখণ্ডে, সিত্তনভাসলের ছাদতলে ও জৈনচিত্রে পাওয়া যায়।[৩২] ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলাই পটচিত্রের প্রধান লক্ষ্য। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু ও তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির প্রভাব থাকলেও ভারতের নানান স্থানের পটচিত্রে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবই সমধিক লক্ষ্য করা গেছে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 'চিত্রকথা' গ্রন্থে লিখেছেন, "জনসাধারণের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে রাখার জন্যই তীর্থভ্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণেরা। এই তীর্থযাত্রীদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় পটচিত্রের পরম্পরা অটুট থেকেছে। বলা চলে পট নামে পরিচিত চিত্রধারা লৌকিক ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মের সঙ্গে জড়িত।"[৩৩] পটচিত্রের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে অশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন, – "বুদ্ধদেব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে স্বয়ং যে 'চরণচিত্র' এর প্রশংসা করেছিলেন তা ছিল পরবর্তীকালের পটচিত্রেরই পূর্বসুরী। কারণ বুদ্ধদেবের দেখা চরণচিত্রের ব্যাখ্যায় খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের লেখক অশ্বঘোষ জানিয়েছেন এই চরণচিত্রে একটি ছবির নিচে অপর একটি ছবি অঙ্কিত হয়। বাংলার পটচিত্রেও দেখা যায় ওপর থেকে নিচে একই ভাবে কাহিনীর ঘটনাগুলিকে পর পর আঁকা হয়েছে।"[৩৪]

রাজস্থান, উড়িষ্যা ও বাংলার পটচিত্র সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উড়িষ্যার জগন্নাথ পট, দক্ষিণ ভারত, গুজরাট ও রাজস্থানের নাথদ্বারে ঝোলানো পট দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞান, শিক্ষা, আনন্দ ও পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলার লোকায়ত চিত্রকলা পটচিত্রের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। হিন্দু, মুসলিম ও আদিবাসী সমাজে বিষয়ে বৈচিত্র্যময় পটচিত্র বাংলাদেশের চিত্রকলার একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। বাংলাদেশের বৃহৎ ভৌগোলিক অবস্থানে পট চিত্রকরেরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় 'পটিদার' বীরভূম ও মেদিনীপুর অঞ্চলে 'চিত্রকর' দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় 'পটুয়া' নামে এরা পরিচিত।[৩৫] এই পটুয়াদের স্থান ছিল সমাজের নিম্নভাগে। যদিও ভৌগোলিক অবস্থানভেদে পটুয়াদের সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। এই সব পটুয়ারা ছিলেন দরিদ্র, অবহেলিত। বাংলাদেশের পটুয়া সম্প্রদায় ধর্মে হিন্দু কি মুসলমান বোঝার উপায় নেই। নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলেও এঁরা পীর ও গাজী পটের সঙ্গে হিন্দু পুরাণ, মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী ও কাহিনীমূলক পটচিত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

বিষয় অনুযায়ী বাংলার পটচিত্রকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

১) সাঁওতাল উপজাতির জন্মকথা ও চক্ষুদান পট

২) যমপট

৩) গাজীপট

৪) হিন্দু-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা পট।

১) সাঁওতাল উপজাতির জন্মকথা ও চক্ষুদান পট ঃ

সাঁওতাল অধ্যুষিত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই ধরনের পটের প্রচলন দেখা যায়। 'কো রিয়াক' নামে সাঁওতাল জাতির উপকথা অনুযায়ী তাদের জন্মকথা চিত্রিত হয়েছে। কাপড়ের পটে কাহিনীর বিষয় পরপর পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে জলমগ্ন বিশ্বচরাচরে উড়ছে দুটি হংসহংসী, কোথাও তাদের বসার স্থান নেই। দ্বিতীয় অংশে একটা কেঁচো অথৈ জলে সামান্য মাটির একটা ভিত গড়ে তুলেছে। তৃতীয় অংশে, হংস হংসী সেখানে বসে দুটি ডিম পেড়েছে। চতুর্থ অংশে ডিম থেকে জন্ম নিয়েছে দুটি সন্তান, একটি নারী ও অন্যটি পুরুষ। পঞ্চম অংশে, এই নারী ও পুরুষের মিলনে জন্ম নিল প্রথম সাঁওতাল। সাঁওতালদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পটকে বলা হয় 'চক্ষুদান পট'– এই ধরনের পট যারা আঁকেন তাদের বলা হয় 'জাদু পটুয়া'। সাঁওতাল গৃহে যখন কেউ মারা যায় তখন মৃতের কল্পিত ছবি এঁকে জাদু পটুয়া সাঁওতাল গৃহে উপস্থিত হন। এই ছবিতে মৃত ব্যক্তির সাদৃশ্য আঁকা হয় না, শুধু বয়স ও লিঙ্গকে অনুসরণ করা হয়। চিত্রের চক্ষু তারকা শুধু আঁকা হয় না, এবং এই চক্ষু তারকাহীন ছবিটি দেখিয়ে মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের বলা হয় চক্ষুহীন অবস্থায় মৃতজন পরলোকে ঘুরে ঘুরে কষ্ট পাচ্ছেন। স্বজনদের কাছ থেকে ভুজ্জি, টাকাকড়ি পেয়ে পটুয়া মৃতের পরিত্রাণস্বরূপ দুটি চক্ষু ছবিতে এঁকে দেন। সাঁওতাল ছাড়া 'ভেদিয়া' উপজাতির মধ্যেও এই চক্ষুদান পট চালু আছে।

২) যমপট ঃ

যমপটে স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য চিত্রিত করা হয়ে থাকে। যমপট হিন্দু ধর্মবিশ্বাস মতে পারলৌকিক বিষয় নিয়ে আঁকা। যমরাজের বিচারে ধার্মিক ব্যক্তির স্বর্গবাস আর পাপী ব্যক্তির নরকবাস ঘটবে। এখানে স্বর্গসুখ ও নরকযন্ত্রণার ছবি আঁকা হয়েছে। স্বর্গে সুন্দরী রমণী পরিবৃত কামকেলীর চিত্র, আর নরকের ভয়ানক বীভৎস যন্ত্রণার চিত্র উভয়ই অমার্জিত। যদিও নীতিশিক্ষার বাহন হিসেবে যমপটের গুরুত্ব আছে।

৩) গাজীপট ঃ

মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গাজী ও পীরদের বীরত্বমূলক অলৌকিক কাহিনী গাজীপটে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও মৈমনসিংহ জেলাতে গাজীপট বিশেষ করে কালু গাজীর পটচিত্রের প্রচলন আছে।

৪) হিন্দু-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা পট ঃ

সমতল বাংলার বিস্তৃত কৃষিজীবী সমাজে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা বিষয়ক পটচিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো হতে কাহিনী অংশ গ্রহণ করে এই পটচিত্রগুলো আঁকা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে জেলা বিশেষে বিশেষ শ্রেণীর পটচিত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যেমন– মেদিনীপুরের কৃষ্ণলীলা ও মঙ্গলকাব্য, বর্ধমান ও নদীয়ায় চৈতন্যলীলা, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় শাক্ত ও বৈষ্ণব বিষয় এবং মনসামঙ্গল চিত্রের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে।

এছাড়া কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে এবং তারকেশ্বরের তীর্থক্ষেত্রে আর এক শ্রেণীর পটচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায় যারা শুধু কালীর পটই আঁকেননি, – দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গণেশ-জননী, শিব, শিব-পার্বতী, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, যশোদা-কৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা, হনুমান, চৈতন্য-ষড়ভুজ ও আরও নানা দেবদেবীর চিত্র এঁকেছেন। এছাড়া এঁকেছেন তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনের নানান চিত্র ও সমস্যা। অভিজাবর্গের উন্মার্গগামিতা, সাহেব-বিবির প্রতিকৃতি, হাতির পিঠে সাহেবের বাঘ শিকার, ঘোড়দৌড়, সুন্দরী লাস্যময়ী বারবণিতা, বারবণিতার কাছে ভেড়া হয়ে যাওয়া বাবু, তারকেশ্বের মহান্ত, এলোকেশী ও নবীনের কাহিনী যা সেকালে সারা দেশে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল, এছাড়া মাছমুখে বিড়াল, সাপের মাছ-গেলা, জোড়া পায়রা, গো-দহন, জননী, মেছুনী ঝি, গিন্নি প্রভৃতি সাধারণ জীবনের ছবিও অঙ্কিত হয়েছিল।

পটচিত্র ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে ভিন্ন ভিন্ন রচনাশৈলীতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পটুয়ারা স্থানীয় রঙই ব্যবহার করতেন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, – "রেখার সাবলীলতা পটচিত্রের প্রাণ। ধীর এবং দ্রুতভাবে টানা রেখা পটুয়ারা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন।"[৩৬]

ব্রতচারী নৃত্যের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত ছিলেন পটচিত্রের একনিষ্ঠ প্রচারক। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কালেক্টর অজিত ঘোষ পটচিত্র সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য পরিবেশন করেন ও পটচিত্র সংগ্রহ করেন। ১৯২০ সাল থেকে পটচিত্র সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধান চলে। শিল্পী যামিনী রায় পাশ্চাত্য রীতির চিত্রাঙ্কনে শিক্ষিত হয়েও শেষে পটচিত্রের আদর্শে চিত্র নির্মাণ করে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

সাগরপারের আলোর প্রভাব ঃ পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রভাব

উনিশ শতকের মাঝামাঝি, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় চিত্রের গৌরবময় ধারা অস্তমিত হয়। পাহাড়ি, কাংড়া কলমের শিল্পীরা গত হলেন, শিখ-চিত্রকলাও নিষ্প্রভ। কিছুকাল টিঁকে রইল ইঙ্গ-ভারত মিশ্রিত

চিত্ররীতির লক্ষ্ণৌ ও পাটনাই কলম। পূর্বে আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত আগমনের ফলে ইউরোপীয় চিত্ররীতি এদেশে আসে। একদিকে দেশি শিল্পী যেমন ইউরোপীয় রীতির প্রতি আকৃষ্ট হন, তেমনি ইউরোপীয় প্রভু দেশি শিল্পীকে দিয়ে ইচ্ছেমতো ছবি আঁকিয়ে নেন। এই ধারাটিকে ইঙ্গ-ভারতীয় রীতির মিশ্রণ বলে উল্লেখ করা যায়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় কোম্পানির রাজস্ব কাউন্সিল বসলে রাজস্থান ও মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারের অনেক শিল্পী পাটনায় চলে আসেন। "১৮০০ সালের মধ্যে কলকাতার পরেই পাটনা পূর্বভারতে কোম্পানি শাসনের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি হয়। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যে কলকাতাতেও কোম্পানির নানা বিষয়ে উৎসাহ দেখা যায়। ১৭৬০-৯০ সালের মধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ-- যেমন স্যার এলাইজা ইম্পে, লেডি ইম্পে, শ্রীমতি হুইলর, ন্যাথানিয়েল, মিড্‌লটন প্রভৃতিরা দেশি চিত্রকরদের নিযুক্ত করে এদেশের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, ফলফুল যথাযথ ভাবে আঁকিয়ে নথিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।"[৩৭]

বিলেতে এই সময়ে ভারতীয় চিত্রের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের দুই শিল্পী দীপচাঁদ ও ধনীরামের নাম বিদেশেও প্রচারিত হয়। কোলকাতায় জয়নালদীন নামে একজন চিত্রশিল্পী ইংরেজ প্রভাবিত ভারতীয় রীতিতে চিত্র এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিমধ্যে বাজারে বিলেতি জলরঙের ছবি ও ছাপা ছবি খুব বিক্রি হতে থাকে। ইংরেজ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা যারা ছবি আঁকতে জানেন তারা এদেশে ঘুরে ঘুরে প্রচুর ছবি আঁকেন। এদের মধ্যে ফ্যানি পার্কস নামে এক মহিলা ও চালর্স গোল্ড নামে এক পল্টনের ক্যাপ্টেনের নাম করা যেতে পারে। ১৮০২ সালে তাঁর 'ওরিয়েন্টাল ড্রইংস' নামে একটি বই বেরোয়। ডাঃ থর্পন্টনের 'টেম্পল অব ফ্লোরা' বিলিয়ম ড্যানিয়েলের 'অ্যানিমেটেড নেচার' নামে বই পাওয়া যায়। এদেশীয় দৃশ্য আঁকার জন্য দেশীয় চিত্রকরদের নিয়োগের মাধ্যমে পাটনা স্কুল এর সূচনা হয়। শিল্পীদের মধ্যে সেবকরাম, হুলাসলাল, জয়রামদাস, ফকিরচাঁদলাল, টুনিলাল, তাঁর ছেলে শিবদয়াললাল ও তাঁর ছেলে ঈশ্বরীপ্রসাদ নাম করেন। পাটনাই রীতি মূলত ইউরোপীয় রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলছিল। শিবলাল ফারকা কারখানার পত্তন করে 'নেটিভ ক্যারাকটারস' নাম দিয়ে অনেক ছবি বিক্রি করেন। এই সমস্ত তাৎক্ষণিক রচিত ছবির জন্য তিনি অনেক দক্ষ শিল্পী নিযুক্ত করেন। ক্রমশ খরিদ্দার ও সমঝদারের অভাবে পাটনাই রীতির চাহিদা কমে আসে। পাটনাই রীতির শিল্পীদের মধ্যে ঈশ্বরীপ্রসাদ ১৯০৪ সালে কলকাতা স্কুল অব আর্টে চারুশিল্প ও ভারতীয় চিত্রকলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে উপাধ্যক্ষ হন। অনেক বাঙালি শিল্পীকে এই সময় তিনি নানান রীতি ও টেকনিকে শিক্ষা দেন।

ইতিমধ্যে ইংলন্ড থেকে ভাগ্যান্বেষী কিছু বৃটিশ চিত্রকর এদেশে আসেন জীবিকার্জনের জন্য। এদের মধ্যে নাম করতে হয় প্রথম মহিলা ইহুদী শিল্পী ইসাক্স এর। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন এবং এক বছরের মতো শিল্পকর্ম করেন। হিলার্ড নামে এক চিত্রশিল্পী মিনিয়েচার পেইন্টিং এ নাম করেন। ওজিয়াম

হামফ্রে এই সময়ে লক্ষ্ণৌর নবাবের দরবারে থেকে ছবি আঁকেন। টমাস হিকি নামে অপর একজন শিল্পী মাদ্রাজ ও কোলকাতায় কিছুদিন কাজ করেন। পরবর্তীতে কোলকাতায় দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এখানেই প্রাণত্যাগ করেন। উইলসন নামে আর একজন শিল্পীও এখানে আসেন ছবি এঁকে জীবিকার্জন করতে। জন টমাস সিটন, লেডি ডায়না হিল এরা ছবি এঁকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। শিল্পী রবার্ট হোম শেষমেশ ভারতবর্ষেই থেকে যান। জর্জ সিনারী নামে এক চিত্রশিল্পী এই সময় বেশ নাম করেন। ঢাকাতে তিনি সেখানকার কালেকটার স্যার চালর্স ডিওলিকে ছবি আঁকা শিখিয়েছিলেন। অদ্ভুত চরিত্রের শিল্পী সিনারীর ব্যক্তি জীবন ছিল ঘটনাবহুল। এখনও কোলকাতার ধনীগৃহে এই শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র দেখা যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ও বর্ধমান রাজবাড়ির অনেকেই সিনারীকে দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকান। বিখ্যাত জাল প্রতাপচাঁদ মামলায় সিনারীর আঁকা প্রতাপচাঁদের প্রতিকৃতি চিত্রখানি বিচারের সময় কোর্টকে সাহায্য করেছিল। শ্রী কৃষ্ণলাল দাস লিখেছেন– "ভারতে আগত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সিনারীই নানা দিক থেকে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ছিলেন। উন্নত অঙ্কনশৈলীর দিক থেকেও তাঁকে অদ্বিতীয় বলা যায়।"[৩৮] এদেশে এসে ছবি এঁকে অনেকে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, আবার অনেকে অর্থাভাবে আত্মহননের পথও বেছে নেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমন্ত্রণে শিল্পী হজেস ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে আসেন। প্রায় তিন বৎসর ভারত ভ্রমণ করে ট্র্যাভেলস ইন ইন্ডিয়া' নামে বিলেতে একটি বই বের করেন। এতে তাঁর আঁকা অনেকগুলো ছবি আছে। হজেস শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণ ও দাবি মেটাতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। অর্থাভাবে আত্মহত্যা করেন শিল্পী আলেফাউন্ডার। পাওনাদারদের ভয়ে পলাতক হন শিল্পী আপ্‌জন। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে চিত্রশিল্পী জর্জ কার্টার ছবি বিক্রি করে বহু অর্থ উপার্জন করে ইংলন্ডে ফিরে যান।

টমাস ড্যানিয়েল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র উইলিয়ম ড্যানিয়েল স্কেচ জাতীয় চিত্র অঙ্কন করে সুনাম অর্জন করেন। এঁরা জলপথে নৌকায় ও স্থলপথে পালকিতে কানপুর, আগ্রা, দিল্লি, শ্রীনগর ভ্রমণ করেন। লক্ষ্ণৌ, ভাগলপুর ও কলকাতায় বাস করেন। পথ চলতে চলতে এঁরা প্রচুর স্কেচচিত্র অঙ্কন করেন ও পথের বিবরণ ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেন। ইংলন্ডে গিয়ে ভারতভ্রমণ বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ফরাসি শিল্পী বালতাজার সোলভ্যাঁ বাংলার আদবকায়দা, রীতি-নীতি ও পোশাক বিষয়ক চিত্রসম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটির নাম, Manner and Customs and Dresses of the Native of Bengal। জ্যোতিষী, সরকার, হুঁকাবরদার, পূজারী, মেছুনি, ঢাকী, ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা প্রভৃতি চিত্র ছিল গ্রন্থটিতে। ডানকান বিচি নামে অপর এক শিল্পী এই সময় খুব নাম করেন। মিসেস নেলসন নামে একজন মহিলা শিল্পী বাংলাদেশের অনেক চিত্র অঙ্কন করেন, যেমন – গুরুবন্দনা, বাঈজীনাচ প্রভৃতি চিত্রগুলো খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

দেশীয় ধনীদের চেষ্টায় কলকাতায় আর্ট স্কুল স্থাপিত হলে এদেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় আদর্শে চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা অর্জন করে ইংরেজ শিল্পীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান ফলে ইংরেজ শিল্পীদের এদেশে আসা

ক্রমশ কমতে থাকে। ফটোগ্রাফির আবিষ্কারে চিত্রশিল্পের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। কলকাতায় অনেক বড় বড় ফটোগ্রাফির কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মিস্ জেন ড্রুমন্ড নামে একজন মাত্র মহিলা শিল্পী সেসময়েই মিনিয়েচার এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন।

ক্রমশ বৃটিশ সরকার এদেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'সোসাইটি ফর দা প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট', 'দা ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট।' ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল, গভর্নর নর্থব্রুকের সমর্থন ও সহায়তায় আর্ট গ্যালারি স্থাপিত হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে চৌরঙ্গীতে আর্ট স্কুল স্থাপিত হলে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ হ্যাভেল আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন।

ইউরোপীয় রীতিতে জলরঙ ও তেলরঙের ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আত্মীয় রবি বর্মা। প্রথম দিকে স্বভাবশিল্পী রবি বর্মা জলরঙ দিয়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন। ১৮৬৮

খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ড থেকে আগত থিয়োডোর জেনসেন নামে ইংরেজ চিত্রকরের কাছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকতে শেখেন। ইউরোপীয় মডেল ও পরিপ্রেক্ষিত রীতি গ্রহণ করে তেলরঙে ছবি আঁকেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের চিত্র প্রদর্শনীতে তৈলচিত্র পাঠিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে চিত্র প্রদর্শনীতে 'শকুন্ত লার চিত্রলিখন' ছবিখানির জন্যও স্বর্ণপদক লাভ করেন। "ত্রিবাঙ্কুর রাজ রবিবর্মাকে শ্রেষ্ঠ চিত্রকররূপে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন – তখন থেকে রবিবর্মা 'রাজা রবিবর্মা' রূপে পরিচিত হন।"[৩৯] যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড ভারত ভ্রমণে এসে ত্রিবাঙ্কুরে যান এবং রবিবর্মার চিত্রগুলো দেখে খুব প্রশংসা করেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের চিত্র প্রদর্শনীতেও তাঁর চিত্র স্বর্ণপদক লাভ করে। রবিবর্মা হিন্দু-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে চিত্রায়িত করেন। তাঁর এই চিত্রগুলো দেখে জনগণ এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে ওই সমস্ত চিত্রের প্রতিলিপির জন্য রবিবর্মার কাছে বিপুল জনসমাগম ঘটতে থাকে। জনগণকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বোম্বে এসে একটি লিথোপ্রেস কিনে তাঁর ছবিগুলো ছাপেন। রবিবর্মার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ওই চিত্রগুলো প্রতিটি ভারতবাসীর ঘরে ঘরে শোভা পেতে থাকে। শিকাগো ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশনে তাঁর আঠারোখানি চিত্র প্রশংসালাভ করে। যাইহোক, পরবর্তীকালে নিন্দা এবং প্রশংসা দুই-ই তাঁর ভাগ্যে জোটে। আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী, ই.বি. হ্যাভেল রবিবর্মার চিত্রের সমালোচনা যেমন করেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবিবর্মার চিত্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। এখনও দক্ষিণ ভারতে রবিবর্মার চিত্রেরই অনুকরণ করা হয়ে থাকে। রবিবর্মার চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য – রামের সমুদ্র শাসন, হরধনু ভঙ্গ, জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ, সীতার পাতাল প্রবেশ, শকুন্তলার পত্রলিখন, চেড়িবেষ্টিতা সীতা,

কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি। রবিবর্মার পথ অনুসরণ করে বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, পেস্টনজী বোম্বানজী, পিথাওয়ালা গোরক্ষকার, তাসকার চিত্র রচনা করেন।

হেনরী হোভার লকের ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শ্যামাচরণ শ্রীমানী চিত্রাঙ্কনে শিল্পী সত্তার পরিচয় দেন। শ্যামাচরণ যদিও স্বাদেশিকতাকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। অন্নদাপ্রসাদ ইউরোপীয় রীতির তেলরঙের চিত্রকলা অনুশীলন করেন। গ্রন্থ চিত্রণেও পারদর্শীতার পরিচয় দেন। প্রতিকৃতি রচনাতেও ছিলেন দক্ষ। রমানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। তাঁর পৌরাণিক ছবিগুলিও উল্লেখযোগ্য, যেমন – কুবেরের লক্ষ্মীপূজা, মানভঞ্জন, শাক্যমুনির আশ্রম। এই সময়ে নবকুমার বিশ্বাস, ফণিভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র পাল কে নিয়ে 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৮), এই আর্ট স্টুডিও থেকে অন্নদাচরণের অঙ্কিত মণীষীদের প্রতিকৃতি ছাপা হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর দায়িত্ব পালন করেন।

আর্ট স্কুলের ছাত্র শশীকুমার হেশ, রোহিনীকান্ত নাগ ও ফণীন্দ্রনাথ বসু ইউরোপে উচ্চতর অ্যাকাডেমিক শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করতে যান। রোহিনীকান্ত ও ফণীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত ভাস্কর। শশীকুমার এদেশে এসে প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইংলন্ডে থাকাকালীন তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে আদৃত হয়েছিলেন, – যেমন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, দাদাভাই নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ। এদেশে এসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশচন্দ্র বসুর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। শশীকুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাইসরয় নর্থব্রুক, বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর স্টুয়ার্ট বেইলি, দাদাভাই নৌরজি, অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম প্রমুখ বিশিষ্ট জনের ছবি আঁকেন। পরে আর্থিক অনটনে পড়ে সস্ত্রীক তিনি দেশত্যাগ করেন।

গঙ্গাধর দে, প্রমথনাথ মিত্র, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য অনুকরণে শিল্পশিক্ষা করে যশস্বী হয়েছিলেন। বামাপদ প্রতিকৃতি ও রামায়ণ-মহাভারতের বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকেন।

অতীত রূপের গভীর টানে ঃ বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট

১৮৮৫ থেকে ১৯১১ সাল আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের জোয়ার আসে, চিত্রকলার ক্ষেত্রে জোয়ার আসে আরও কিছুকাল পরে। চিত্রকলার নতুন যুগে যাঁরা শিক্ষানবিশ হয়ে এলেন তাঁদের সকলে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, এবং শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাঁরা শিক্ষকতা করতে এলেন তাঁরা অধিকাংশই হলেন পণ্ডিত এবং ভারতীয়

সমাজ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ই.বি. হ্যাভেল কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণের স্থলে ভারতীয় শিল্পাদর্শকে গ্রহণের কথা বলেন। অশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার চিত্রকলা'তে লিখেছেন, "হ্যাভেলের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের পিছনে ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পভাবনার ভিত্তিভূমি ও ভারতীয় শিল্পকলার মহৎ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস।"[৪০] ইউরোপের শিল্পবিপ্লবপূর্ব কলাশিল্পের আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ ছিল হ্যাভেলের, আর তারই পথ ধরে মনের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতীয় মূর্তিকলা ও কারুশিল্পে। আর্ট স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তাঁর মনে হয়েছিল প্রাচ্য কলাশিল্প অবহেলিত হচ্ছে এবং ভারতীয় ছাত্ররা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। হ্যাভেলের চেষ্টায় প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তাঁরা মনে করেন হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের ইউরোপীয় কলাশিল্পের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্র রণদাপ্রসাদ গুপ্তের পরিচালনায় জুবিলি আর্ট আকাদেমি (১৮৯৭) স্থাপিত হয়। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক শিল্পীই পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৮৯৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ একযোগে নতুন দৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় কলাশিল্পের অনুশীলন করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার পুনর্জাগরণে ব্রতী হবার জন্য হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আহ্বান জানান। হ্যাভেলের উদ্যোগে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের চিত্র প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিত্র স্থান পায়, তন্মধ্যে 'অন্তিম শয্যায় শাহজাহান' চিত্রটি পুরস্কৃত হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গিলার্ডি অবসর নিলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশ এবং তাঁর প্রবর্তিত নব্য ভারতীয় চিত্ররীতির বিবর্তনে দুটো ঘটনা উল্লেখযোগ্য, এক হল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, দ্বিতীয়টি জাপানি চিত্রকলার গুরু ওকাকুরার সান্নিধ্য লাভ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ফলে অবনীন্দ্র চেয়েছিলেন স্বদেশী ভাব-ভাবনা ও রীতিতে এক নতুন চিত্রশৈলী উদ্ভাবন করতে। ওকাকুরা জাপানি শিল্পশাস্ত্রের অধ্যাপক এলেন ভারত দর্শনে, প্রাচ্য সংস্কৃতির রসে নিমগ্ন তিনি – এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অনৈক্যকে শিল্পসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। ভগিনী নিবেদিতা চেয়েছিলেন এদেশে ভাবসমৃদ্ধ এক কলাশিল্পের বিকাশ ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন। আর অবনীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় শিল্প জাগরণের অবিসংবাদী নেতা তা জানতেন নিবেদিতা – তাই ওকাকুরাকে নিয়ে এলেন ঠাকুরবাড়িতে – "... নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার শিল্প-সহযোগ, ঠাকুরবাড়ির শিল্প-অঙ্গনে তাঁর প্রবেশ, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলীর, বিশেষত নন্দলালের উপরে তাঁর প্রভাব – সব জড়িয়ে আধুনিক ভারতীয় শিল্পে জাপানি ধারার বিস্তার। এর সূচনা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দ, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতার সূত্রেই।"[৪১]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় 'বঙ্গীয় কলা সংসদ' – সংসদের সভাপতি হন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ও সম্পাদক হন অবনীন্দ্রনাথ। হ্যাভেল অসুস্থ হয়ে কলকাতা ত্যাগ করলে মূলত অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বেই নব্য ভারতীয় অর্থাৎ প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অশোক ভট্টাচার্য তার 'বাংলার চিত্রকলা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন – "নিবেদিতার প্রচেষ্টাতেই বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষ এই নব্য-ভারতীয় শৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জগদীশ নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের দিয়ে অলংকৃত করেছেন তাঁর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। কিন্তু রামানন্দের অবদান এক্ষেত্রে অনেক বড়। তাঁর উদ্যোগেই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ছাপা হতে থাকে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের নাতিশিক্ষিত, শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে – এমনকি ভারত বিষয়ে উৎসাহী বিদেশিদের কাছেও। এই পত্রিকাতেই এক নতুন চিত্রশৈলীর পক্ষে কলম ধরেন নিবেদিতা, আনন্দ কুমারস্বামী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এবং সি. এফ. এন্ড্রুজ। অথচ এই রামানন্দই একসময় ছিলেন তখনকার অন্যান্য ইংরেজি শিক্ষিতজনের মতোই ইউরোপীয় রীতিতে ভারতীয় পুরাণকথার চিত্রকর রবিবর্মার এক উৎসাহী প্রচারক – রবিবর্মার ওপর লেখা প্রথম একটি সচিত্র ইংরেজি গ্রন্থের রচয়িতাও ছিলেন তিনি। নিবেদিতাই তাঁকে ইউরোপীয় চিত্রকলা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভারতীয় আদর্শের নব্য-বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর পরিপোষক করে তোলেন। রামানন্দ কেবল সাময়িকপত্রে নয়, তাঁর প্রকাশিত বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতেও এই নতুন ধারার শিল্পীদের আঁকা ছবি ছেপে সেগুলিকে বাংলার অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও প্রচারিত করেন। তাঁর ছাপা রঙিন অ্যালবামগুলির সাহায্যেই এই নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর শিল্পীদের ছবি চিত্ররসিকদের কাছে সহজলভ্য হয়।"[৪২]

অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যরীতিতে চিত্রশিক্ষা করলেও এক নতুন রীতি উদ্ভাবনের সাধনা তাঁকে করতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ছাত্ররা শুরু থেকে ভারতীয় শিল্পাদর্শের শিক্ষা ও পরিচয় পেয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণকথা, কালিদাসের কাব্যকে অনুসরণ করেই চিত্র রচনা করলেন। ভগিনী নিবেদিতার ইচ্ছায় অবনীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় লেডি হ্যারিংহামের সঙ্গে

নন্দলাল, অসিতকুমার, ভেঙ্কটাপ্পা ও সমরেন্দ্রনাথ অজন্তা চিত্রের নকল করতে অজন্তা যান (১৯০৯)। সেখানে তাঁরা ভারতীয় চিত্রের ঐতিহ্য, রূপাদর্শ প্রত্যক্ষ করলেন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করলেন। ফলে নন্দলালের ছবিতে অজন্তা চিত্রের রূপাদর্শ গৃহীত হয়েছিল সার্থকভাবে। নন্দলাল সহ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য সম্প্রদায় পাঁচ বছর আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১১ নাগাদ বেরিয়ে এলেন। নন্দলাল তাঁর ছবিতে ক্ল্যাসিক আদর্শকে রূপ দিলেন। অসিতকুমার রূপ দিলেন রোমান্টিক গীতিধর্মিতাকে; ভেঙ্কটাপ্পা তাঁর ছবিতে আনলেন লৌকিক মেজাজ আর ক্ষিতীন্দ্রনাথ নিজস্ব আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলেন। "প্রথম দিকে তিনি প্রধানত কালিদাসের শকুন্তলা এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের জীবন ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অবলম্বনে আঁকা

ছবির মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত শৈলীর এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির স্বীকৃতি লাভ করেন"[৪৩]। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধারকে অভিনন্দিত করেন শ্রীঅরবিন্দ।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে দেশি ও বিদেশি কলারসিকের সম্মিলনে গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্র, নর্মান ব্লান্ট, বিচারপতি উডরফ, সুইডিস রুবেনসন ও মোলার, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও এডওয়ার্ড থর্নটনের উদ্যমে সোসাইটি গঠিত হয়। সোসাইটির লক্ষ্য হল প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্পের প্রতি আগ্রহ ও জ্ঞানসঞ্চার। তার জন্য শিল্পালোচনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা। "সোসাইটি আয়োজিত বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রধানত প্রদর্শিত হতে থাকল সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী। এই বাৎসরিক প্রদর্শনীগুলির যে সংবাদ ও সমালোচনা সে সময়ে দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হত, তাই-ই অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্রশৈলীর কথা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তাছাড়া, সোসাইটি এই নব্যরীতির শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করেছিল। সোসাইটির সদস্যরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর কৃতী ছাত্রদের ছবি কিনেও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন।"[৪৪]

সোসাইটির আয়োজিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী কলকাতা শহর ছাড়িয়ে এলাহাবাদ, মাদ্রাজ এমনকি ফ্রান্সের প্যারিসেও অনুষ্ঠিত হয় (১৯১৪), সেখান থেকে লন্ডন এবং লন্ডন থেকে জাভাতেও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় বিচিত্রাভবন সৃষ্টি করে (১৯১৫) শিল্পকলার এক মিলনক্ষেত্র গড়ে তুললেন। এখানে নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, মুকুলচন্দ্র দে ছবি আঁকার সুযোগ পেলেন। গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রগুলো লিথো পদ্ধতিতে ছাপা হতে থাকে। ওই বৎসর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে অবনীন্দ্র শিষ্যমণ্ডলী শান্তিনিকেতনে মিলিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে, নন্দলালের পরিচালনায় শান্তিনিকেতন হয়ে উঠল নব্য ভারতীয় বা আধুনিক চিত্রকলার সৃজনক্ষেত্র। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়লেন ভারতের নানান দিকে। অসিতকুমার জয়পুরের মহারাজার আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হন, সেখানে দু'বছর কাটিয়ে লক্ষ্মৌ সরকারি আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রায় কুড়ি বছর। শৈলেন্দ্রনাথ দে বারাণসী শিল্পভবন থেকে যোগ দেন জয়পুর আর্ট স্কুলে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ঊনত্রিশ বৎসর বয়সেই মাদ্রাজের সরকারি আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে যোগ দেন, পরের বৎসর প্রিন্সিপাল হন। সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাহোরে মেয়ো স্কুল অব আর্টস এ শিক্ষকতা করে ইউরোপ ঘুরে এসে প্রিন্সিপাল পদে যোগ দেন। প্রমোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যাপক হন।

পশ্চিম ভারতের শিল্পীরা নব্য ভারতীয় চিত্ররীতিকে অস্বীকার করলে তা নব্য-বঙ্গীয় বা নিও-বেঙ্গল শৈলী নামে পরিচিত হয়। অবনীন্দ্র তাঁর ছাত্রদের যোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং নবপ্রবর্তিত শিল্পকলাকে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সমণ্বয়ের নতুন পথে ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রধারার দ্বন্দ্ব ও সমণ্বয়

নব্যভারতীয় চিত্ররীতির বিকাশ ও অগ্রগতি সর্বার্থক সমর্থন পেয়েছিল তা নয়। বাঙালি বিদগ্ধজন সকলেই নতুন শৈলীর পক্ষপাতী ছিলেন না। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর আদর্শকে নানা দিক থেকে মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যগত আনুগত্য ছেড়ে পরিবর্তনশীল জীবনলীলায় সাড়া দিতে। বিশিষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী বিনয়কুমার সরকার যিনি ইউরোপীয় আধুনিক কলাশিল্পের যুগান্তকারী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তিনিও চাইছিলেন ছবি যেন তার বিষয়ের চেয়ে রূপনির্মিতির বিচারকে গুরুত্ব দেয়।

হ্যাভেলের সময়েই জুবিলি আর্ট আকাদেমিকে কেন্দ্র করে সমান্তরাল ইউরোপীয় রীতির চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি চালু হয়। এই আকাদেমি থেকে পাশ্চাত্য চিত্ররীতিতে দক্ষ অনেক শিল্পী বের হন। যেমন – নরেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, যোগেশচন্দ্র শীল, অভয়াচরণ দাস, অতুলচন্দ্র বসু, প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলাদেশে পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলা জাগরুক রাখার ক্ষেত্রে যামিনীপ্রকাশের অবদান উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে অবসর নিলে যামিনীপ্রকাশ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষাদানের প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন। জুবিলি আর্ট আকাদেমির ছাত্র নরেন্দ্রনাথ জল ও তেলরঙে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, কৃষ্ণলীলা ও ঐতিহাসিক বিষয়ক ছবি আঁকেন। যোগেশচন্দ্র আঁকেন পল্লীবাংলার মনোরম দৃশ্যচিত্র এবং বাঙালি ঘরের মেয়েদের চিত্র। পাশ্চাত্য রীতির ছবি এঁকে বাংলার বাইরেও যশস্বী হন অতুলচন্দ্র বসু, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ও প্রহ্লাদ কর্মকার। চিত্রকর হিসেবে অতুলচন্দ্র বসু সারা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিসেবে পরিচিত হন। সে সময়ের বিখ্যাত সব মণীষীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন, যেমন – রামমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এডুইন এজলি, মধুসূদনপত্নী হেনরিয়েটা প্রমুখ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অতুলচন্দ্রের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান আকাদেমি অব ফাইন আর্টস'। পরের বছর গঠিত হয় 'দি সোসাইটি অব ফাইন আর্টস'। পাশ্চাত্য চিত্রকলার বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। "১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশীয় উভয়রীতির চিত্রকলার পরিপোষকতার আদর্শ সামনে রেখে মহারাজা

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে ও অতুলচন্দ্র বসু প্রমুখের সহযোগিতায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস এর পত্তন হয়।"[৪৫] পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি এঁকে নাম করেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। সিক্তবসনা নারীরূপ হল তাঁর এক প্রিয় বিষয়। প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার সাধারণ মানুষের ছবি আঁকেন, আঁকেন নৈশচিত্র। পাশ্চাত্য ধারার অপর এক নামকরা শিল্পী হলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। পৌরাণিক চিত্র ও প্রতিকৃতি রচনায় দক্ষ ছিলেন তিনি। শিল্পী বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও একজন দক্ষ প্রতিকৃতি চিত্রকর রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বসন্তকুমার ভারতীয় রীতিতেও ছবি আঁকেন এবং কার্টুন চিত্র এঁকেও নাম করেন। এঁরা প্রত্যেকে শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিশোরী রায়, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কুণালকুমার মুখোপাধ্যায় এই সময়ের পাশ্চাত্য রীতির শিল্পী। ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছাত্র চিন্তামণি কর, প্রাণকৃষ্ণ পাল, নীরদ মজুমদার ইউরোপীয় কলাশিল্পের প্রতি অনুপ্রাণিত হন। রণদাচরণ উকিল, সুধাংশুশেখর চৌধুরী নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতির পথ ধরে আপন শৈলী গড়ে তোলেন। ভাস্কর ও চিত্রকর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী চিত্রশৈলীর এই দুটি ধারাকেই বহন করে চললেন সারাজীবন। "আশ্চর্য এই যে তিনি এই দুই বিপরীত রীতিতেই অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছবি এঁকে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় তাঁর নির্ভুল অ্যানাটমি জ্ঞান তাঁর ছবির মধ্যে এক দৃঢ়বদ্ধ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। কী অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ওয়াশ, কী পাশ্চাত্যরীতির তেলরঙ বা প্যাস্টেল, কী টেম্পেরা, সকল মাধ্যমেই তিনি সমান পারদর্শিতার পরিচয় দেন। কিন্তু ভাস্কর ও চিত্রকর হিসেবে সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল, তিনি নব্য-বঙ্গীয় শিল্পকলাকে বাস্তবধর্মী জীবনবোধের শক্ত ভিতের ওপর স্থাপন করে বৃহত্তর সমাজজীবনের অঙ্গ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[৪৬]

বিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার চিত্রকলার বহুমুখী বিকাশ সূচিত হয়। গগনেন্দ্রনাথ নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর আন্দোলনে ভূমিকা নিলেও নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশ ঘটিয়ে অবচেতন মনের গভীরতাকে রূপ দিয়েছিলেন। যামিনী রায় নতুন ধারার ছবি এঁকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা পেলেন। শিল্পী অমৃতা শেরগিল প্যারিস থেকে চিত্রাঙ্কন শিখে ভারতবর্ষে ফিরে এসে শিল্পের প্রেরণা পেলেন ভারতীয় পারিপার্শ্বিকতায়, জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। ছবি আঁকলেন ভারতীয় ও ফরাসি মিশ্র আঙ্গিকে। অমৃতা শেরগিলও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, জাতীয়তাবাদী রক্ষণশীল দৃষ্টভঙ্গির বদলে আমাদের উদারনীতির পথ অবলম্বন করতে হবে। বেঙ্গল স্কুল আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল জাতীয়তাবাদী প্রেরণা, স্বদেশি শিল্পের উন্মাদনা। গান্ধিজীর স্বদেশি আন্দোলনই এই শিল্প প্রেরণার উৎস। কিন্তু যুগের পরিবর্তন মেনে নিয়ে বিশ্বের নব আবিষ্কৃত কলাকৌশলের সুযোগ নিয়ে শিল্পকে সঞ্জীবিত না করলে অচিরেই হারিয়ে যেত হবে।

রবীন্দ্র, গগনেন্দ্র, যামিনী রায় ও অমৃতা শেরগিলের আদর্শে নতুন পথের সন্ধানে ক্যালকাটা গ্রুপ এর জন্ম হল (১৯৪৩)। প্রদোষ দাশগুপ্ত, পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার, কমলা দাশগুপ্ত প্রমুখের সক্রিয় চেষ্টায়। এতে যোগ দিলেন সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, অবনী সেন, রথীন মিত্র, গোবর্ধন আশ, সুনীলমাধম সেন ও হেমন্ত মিশ্র। প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এটা প্রায় অবিশ্বাস্য যে আমরা কয়েকজন বাঙালি যুবক শিল্পী ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ এই দশ বছরের মধ্যে বেঙ্গল স্কুলের ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের শিল্প আন্দোলন চালিয়ে বেঙ্গল স্কুলের অত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গ্রুপকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম, যার প্রভাব সারা ভারতবর্ষ কেন, ভারতবর্ষের আশেপাশে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান ইত্যাদি স্থানেও প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হত। আমার নিজের ধারণা বেঙ্গল স্কুলের কাঠামো শিল্পের শক্ত বাঁধুনিতে তৈরি হয়নি। একটা মিথ্যা জাতীয়তাবোধের ভাবপ্রবণতাই ছিল এর বাঁধুনি আর দেবদেবীর সহজবোধ্য বিষয় ছিল এর প্রেরণা। তাই সাধারণের কাছে এর মূল্য ছিল শিল্পের খাতিরে নয়, নিছক জাতীয়তার ভাবপ্রবণের দিক থেকে। তাই মনে হয়, আমরা ঠিক সময়ে আমাদের আন্দোলন চালাতেই জনসাধারণের নতুনের স্পষ্ট ইঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে নতুন করে ভাবতে চাইল শিল্পের মূল তত্ত্ব, বিশেষ করে তার অভিব্যক্তি মানুষের মধ্য দিয়ে।"[৪৭] ধর্মনিরপেক্ষতা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন, গণতন্ত্র, সাম্যবাদের ধারণা, ইউরোপের শিল্প আন্দোলন, আধুনিক শিল্পের মর্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে আর্টের উদ্দেশ্য শুধু দেশ কালের সীমায় আবদ্ধ রইল না, আন্তর্জাতিক নির্ভরতামূলক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে আর্টের সজীবতা লক্ষ্য করা গেল। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আন্দোলনের ভেতর দিয়ে মানুষের কথাই শিল্পসাহিত্যে স্থান করে নিল। মানুষ সমগ্রতায় এসে ধরা দিল। প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখেছেন – "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যার অমরবাণী আমরা আমাদের গ্রুপের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, তিনি চণ্ডীঠাকুর, কোনো রাজনীতির নাগপাশে বাঁধা পড়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেননি – তাই আমরা মানুষকে দেখেছি তার সার্বিক অস্তিত্বে, তার শোক-দুঃখ, ভয়-ভীতি, আচার-ব্যবহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রেম-ভালোবাসার দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের শিল্পের কারবার শুধু মানুষের দুঃখ, ভয়-ভীতি, দারিদ্র্য, নিপীড়ন, রোগ-শোক এরই মধ্যে নিবদ্ধ থাকেনি। মানুষ বলতে আমরা মানুষের গুণাগুণ, তার সামাজিক একটা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছি।"[৪৮]

গ্রন্থ নির্দেশিকা ঃ

১। অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা-৯, জানুয়ারি, ১৯৯৫, পৃঃ ২৮

২। ওই, পৃঃ ৩০

৩। ওই, পৃঃ ৩১

৪। ওই, পৃঃ ৩৪-৩৫

৫। ওই, পৃঃ ৩৫

৬। ওই পৃঃ ৩৯

৭। ওই পৃঃ ৪১

৮। বিমল দেব, চিত্রকলায় পূর্বপশ্চিম, স্টার পাবলিকেশনস, কলিকাতা-৮, জুন-১৯৮৮, পৃঃ ৩৫

৯। অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯

১০। ওই, পৃঃ ৭৯

১১। ওই, পৃঃ ৮১

১২। অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৩৩

১৩। ওই, পৃঃ ৩৩

১৪। সরসী কুমার সরস্বতী, পাল যুগের চিত্রকলা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ২৭-২৮

১৫। ওই পৃঃ ১৫৩

১৬। বিমল দেব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯

১৭। ঐ, পৃঃ ৫০

১৮। অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০

১৯। বিমল দেব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯

২০। অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫

২১। কৃষ্ণলাল দাস, শিল্প ও শিল্পী (দ্বিতীয় খণ্ড - প্রাচ্য শিল্পকলা), প.ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, পৃঃ ২৭৭

২২। ঐ, পৃঃ ২৭৭

২৩। ঐ, পৃঃ ২৯৩-২৯৪

২৪। অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬

২৫। বিমল দেব, চিত্রকলায় পূর্ব পশ্চিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪

২৬। ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০

২৭। অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬

২৮। ঐ, পৃঃ ১১০

২৯। কৃষ্ণলাল দাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩

৩০। ঐ, পৃঃ ৩৩৭

৩১। সৈয়দ মাহ্‌মুদুল হাসান, মুসলিম চিত্রকলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯

৩২। অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮

৩৩। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকথা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯১, পৃঃ ৬৭

৩৪। অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮

৩৫। ঐ, পৃঃ ৯০

৩৬। বিনোদবিহারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮

৩৭। অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৫৯

৩৮। কৃষ্ণলাল দাস, শিল্প ও শিল্পী (২য় খণ্ড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নভেম্বর ১৯৮২, পৃঃ ৩৬৩

৩৯। ঐ, পৃঃ ৩৬৭

৪০। অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮

৪১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিবেদিতা লোকমাতা (চতুর্থ খণ্ড - নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প আন্দোলন), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃঃ ৪১

৪২। অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩-১৩৪

৪৩। ঐ, পৃঃ ১২৯

৪৪। ঐ, পৃঃ ১৩৭

৪৫। ঐ, পৃঃ ১৪৭

৪৬। ঐ, পৃঃ ১৮৪

৪৭। প্রদোষ দাশগুপ্ত, স্মৃতিকথা শিল্পকথা, ক্যালকাটা গ্রুপ, প্রতিক্ষণ পাবলিশার্স প্রা.লি., অক্টোবর ১৯৮৬, পৃঃ ৪৯

৪৮। ঐ, পৃঃ ৪৪